দাম : পাঁচ টাকা

স্বস্তিকা

১৮ জুলাই - ২০১১, ১ শ্রাবণ - ১৪১৮ ।। ৬৩ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা

সার্ধশতবর্ষে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ❑

সংবাদ প্রতিবেদন ❑ অমলেশ মিশ্র ❑

কেন্দ্রে কংগ্রেসী সরকার মানেই আর্থিক কেলেঙ্কারি ❑

প্রবল গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার সিপিএম ❑

সিঙ্গুর : কুর্সীর এপার ওপারের ফারাক অনেক ❑ দেবব্রত চৌধুরী ❑

সোনিয়া গান্ধী কি লুকোতে চাইছেন? ❑ রাজিন্দর পুরী ❑

সার্ধশতবর্ষের মূল্যায়ন : পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও ভারতীয় চেতনা ❑ ডঃ প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় ❑

হিন্দুদের জন্য ভাবনা, সাম্প্রদায়িকতা ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ❑ চিত্তব্রত পালিত ❑

সমীক্ষায় উঠে এল বিস্ফোরক তথ্য, ভারতে এন জি ও-গুলোর হাতে ব্যাপক বিদেশী অর্থ ❑

অন্ধ্রের গরীব গ্রামবাসীদের ওপর চলছে বেপরোয়া ওষুধ পরীক্ষা ❑

চৈতন্যযুগের পরবর্তীকালে নতুন ধারার মন্দির ❑ প্রণয় রায় ❑

গর্ব নাশ, বিনয় প্রকাশ ❑ চতুর্থ পাণ্ডব ❑

ঐতিহাসিক দুর্গ জয়সলমীর ❑ সোমশুভ্র চক্রবর্তী ❑

রাজনীতিতে বংশপরম্পরা কি অবসানের পথে? ❑

নিয়মিত বিভাগ

এইসময় : ❑ অন্যরকম : ❑ চিঠিপত্র : ❑ ভাবনা-চিন্তা : ❑ নবাঙ্কুর : ❑ কর্মযোগ : ❑ সমাবেশ-সমাচার : ❑ রঙ্গম : ❑ শব্দরূপ : ❑ চিত্রকথা : ❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

সার্ধশতবর্ষে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য— ১৪-১৬

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৩ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা, ১ শ্রাবণ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৩, ১৮ জুলাই - ২০১১

দাম : ৫ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪৪০৮০৩৪২

Registration No.-Kol.RMS/048/2010-2012

LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT

L. No.-MM & P.O. / SSRM-KOL.RMS RNP-048/LPWP-028/2010-12

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

জমি যেন শোষণের হাতিয়ার না হয়

সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, উত্তরপ্রদেশের ভট্টা পারসৌল, ওড়িশার নিয়মগিরি—জমি অধিগ্রহণ লইয়া স্থানীয় মানুষের সহিত সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারগুলির বিবাদ চরমে পৌঁছাইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে চৌত্রিশ বছর ধরিয়া রাজত্ব করিবার পর নিজেদের কৃষক বন্ধু বলিয়া জাহির করা সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার যেভাবে পর্যুদস্ত হইয়াছে তাহার অন্যতম কারণ শিল্পের বিকাশের নামে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের কৃষকদের জমি বলপূর্বক অধিগ্রহণ। সিপিএম সরকারের সেই স্বৈরতান্ত্রিক আচরণের কথা রাজ্যের মানুষ ভোলে নাই। সুযোগ পাইবামাত্র কুলোর বাতাস দিয়া বিদায় করিয়াছে। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে ক্ষমতায় আসিলে বামফ্রন্ট সরকারের অধিগৃহীত জমি যথাশীঘ্র সম্ভব ফিরাইয়া দিবেন। সম্প্রতি সর্বোচ্চ আদালত জমি ফিরাইয়া দেওয়ার কাজ বন্ধ রাখিবার নির্দেশ দিয়া টাটাদের পক্ষে এক স্থগিতাদেশ জারি করিয়াছে। কিন্তু একই সঙ্গে ইহাও স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে যেহেতু মামলাটি উচ্চ আদালতের বিচারাধীন, তাই এই স্থগিতাদেশ মামলার রায়ে কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে—এইরূপ আশঙ্কা করিবার কোনও কারণ নাই। আদালতের এই আশ্বাসের ভিত্তিতে উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশকে মমতা ব্যানার্জীর সরকার স্বাগত জানাইয়াছে।

বিড়ম্বনা হইল, দুই পক্ষই আদালতের রায়কে স্বাগত জানাইলেও এই আইনী লড়াই দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিতে পারে। এই বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই যে যেভাবে জোরজবরদস্তির সহিত কৃষকদের জমি ছিনাইয়া লইয়া টাটাগোষ্ঠীর হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা অপরিণামদর্শী স্বৈরাচারের নামান্তর। এই কথাও কেহ অস্বীকার করিতেছে না যে বামফ্রন্ট সরকারের আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করিয়াই টাটা গোষ্ঠী অধিগৃহীত জমির উপর কারখানা নির্মাণের জন্য কয়েক হাজার কোটি টাকা ঢালিয়াছে। টাটা গোষ্ঠীর আশঙ্কা হইল জমির পাট্টা কৃষকদের ফিরাইয়া দেওয়া হইলে নিজেদের দামী যন্ত্রপাতি বাহির করিয়া আনিতে অসুবিধা হইবে।

ওড়িশায় জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি নবীন পট্টনায়েক সরকারের গলার কাঁটা হইয়া রহিয়াছে। নিয়মগিরির অধিবাসীদের ত্রাণকর্তা হইয়া প্রথমে রাহুল গান্ধী বেদান্ত-পস্কোর জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে ঢাকঢোল পিটাইয়া প্রচারের আলোয় উদ্ভাসিত হইলেও এখন আর তাহাকে দেখা যাইতেছে না। উত্তরপ্রদেশের মতো ওড়িশাও অকংগ্রেসী সরকারের শাসনাধীন। তাই জমি অধিগ্রহণের বিষয়টিকে কেন্দ্র করিয়া কংগ্রেস ফায়দা তুলিতে চাহিতেছে। কিন্তু এখানে বিষয়টি একটু জটিল। কেননা ইউপিএ সরকারই বেদান্ত—পস্কোর ওই জমিতে কারখানা শুরু করিবার প্রয়োজনীয় অনুমোদন দান করিয়াছে।

কেন্দ্রের মনমোহন সিং সরকারের আর্থিক সংস্কারের কারণে গ্লোবালাইজেশন বা ভুবনায়নের সুযোগ লইয়া বহুজাতিক কোম্পানীগুলি (এম এন সি) মুনাফা লুটিবার জন্য ভারতের বাজারে ঢুকিয়া পড়িতে চায়। দেশের সাধারণ মানুষ সরকারের এই নীতির সঙ্গে একমত না হইলেও কেন্দ্র সরকারের কাছে এইসব বহুজাতিক কোম্পানীগুলির শিল্পপতিরা আদরের পাত্র কিন্তু কৃষকরা যেন সতীনের সন্তান। উন্নয়নের যে মডেল মনমোহন-আলুওয়ালিয়া, প্রণব-চিদাম্বরম খাড়া করিয়াছেন, তাহাতে জমি অধিগ্রহণ করিয়া শিল্প গড়িবার বিষয়টিকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। মনমোহন সিং সরকারের চিন্তার কারণ হইল যে বিষয়টি বিদেশী বিনিয়োগের সহিত জড়িত এবং কোনও কারণে বিলম্ব হইলে বিনিয়োগকারীরা মুখ ফিরাইয়া লইতে পারেন। দেখা যাইতেছে, জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি যদি নিজের দলের সরকার করিয়া থাকে তবে তাহা ঠিক , আর ইহার অন্যথা হইলে গরীব মানুষের জন্য কান্নায় বুক ভাসিয়া যায়।

আসল সমস্যা হইল, চাষের এই জমি হইতে মাফিয়া বা নেতারা টাকা লুঠিতে চায়। আমাদের একটি বড় অসুবিধা হইল যে জমি অধিগ্রহণ আইনটি বৃটিশ শাসকদের রচিত এবং প্রজাদের হিতের নামে নিজেদের স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যেই তাহারা তাহা প্রণয়ন করিয়াছিল। সারা দেশের মানুষের ভাবনা-চিন্তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সরকার আজ জমি অধিগ্রহণ এবং সেই অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করুক। দেখিতে হইবে জমি যেন শোষণের হাতিয়ার না হইয়া উঠে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

মা লক্ষ্মী, কৃপা কর, কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেব না। ঘরের থাকতে পরের নেব না। শাঁখা থাকতে চুড়ি পরবো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করবো না। মোটা বসন অঙ্গে নেব। মোটা ভূষণ আভরণ পরবো। পড়শীকে খাইয়ে নিজে খাব। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক, মোটা বস্ত্র অক্ষয় হোক। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুক।

— রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী

হিন্দু বিরোধী বিলের প্রতিবাদে সরব হিন্দু জাগরণ মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। হিন্দুদের ঘাড়ে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে দাঙ্গা হোক বা না হোক, তার দায় চাপাতে কেন্দ্রীয় সরকার আনতে চলছে প্রিভেনশান অফ কম্যুনাল অ্যান্ড টার্গেটেড ভায়োলেন্স বিল-২০১১। এনিয়ে গত ৯ জুলাই রামমোহন হল প্রেক্ষাগৃহে সরব হলো হিন্দু জাগরণ মঞ্চের দক্ষিণবঙ্গ শাখা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক অসীম কুমার মিত্র, বিশিষ্ট আইনজীবী ও ন্যাশনালিস্ট ল' ইয়ার্স ফোরামের ক্ষেত্রীয় সম্পাদক জয়দীপ রায় ও বিজেপি'র সাধারণ সম্পাদক শমীক ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ওড়িশা পুলিশের প্রাক্তন ডিজি বাণীপদ সাহা।

বিলটি যে ইউ পি এ সরকারের মদতপুষ্ট একদল সেকুলারিস্ট ভারতবাসীর হিন্দু বিরোধী পলিটিক্যাল অ্যাজেন্ডা তা স্পষ্টই উঠে এসেছে বক্তাদের বক্তব্যে। আইনজীবী জয়দীপ রায় 'চ্যাপ্টার' ও 'সেকশন' ধরে ধরে এই তুঘলকি বিলটি-র মাধ্যমে দেশের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় কিভাবে আঘাত হানার চেষ্টা হচ্ছে তা তুলে ধরেন। তিনি বলেন,—'এই বিলটির চ্যাপ্টার ৩-এ বলা আছে ইন্টারন্যাল ডিস্টারবেন্স-এর কথা। ভারতীয় সংবিধানের ৩৫৫ ধারাতেও এই ব্যাপারটি রয়েছে। সংবিধানে এই পথটার কথাও উল্লেখ আছে যে ৩৫৫ ধারায় অভ্যন্তরীণ গোলমালের আশঙ্কা দেখা দিলে ৩৫৬ ধারা জারি করার সাংবিধানিক প্রস্তুতি কেন্দ্র শুরু করে দিতে পারে। ৩৫৬ ধারা মানে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি, জরুরি অবস্থা ঘোষণা।' প্রসঙ্গত ক্ষমতা কুক্ষিগত করার এহেন প্রয়াস সুকৌশলে চালু হয়েছিল ২০০২-এ গোধরা পরবর্তী দাঙ্গার পর থেকেই। পরে ইউপিএ ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর ২০০৫-এ এই বিলটি সংসদে পাশ করানোর চেষ্টা হলেও তা প্রত্যাখ্যাত হয়। আশঙ্কার কথা জয়দীপবাবু যেটা উল্লেখ করলেন তা হলো এই 'প্রিভেনশান অফ কম্যুনাল অ্যান্ড টার্গেটেড ভায়োলেন্স বিল, ২০১১'-এর অধিকাংশই গৃহীত হয়েছে রোমের আইন থেকে। বাকিটা ২০০৫-এ সংসদে প্রত্যাখ্যাত সেই বিলটি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

সাংবাদিক অসীম কুমার মিত্র এই বিলটি প্রণয়নের পেছনে সোনিয়া গান্ধীর 'হিডিন অ্যাজেন্ডা' উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের সামনে উন্মোচিত করেন। তিনি বলেন—'গত বছর ৪ জুলাই পোপ ভারত ভ্রমণ করে বলে গিয়েছেন তৃতীয় সহস্রাব্দে তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ভারতে খৃস্টানীকরণ। সেই লক্ষ্যেই পোপের একান্ত অনুগত সোনিয়া গান্ধী এইসব কর্মকাণ্ড ঘটাচ্ছেন।"

বক্তারা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, কোনও দাঙ্গার তদন্তের জন্য যে কমিটি গঠিত হবে তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা হবেন তথাকথিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তি। এবং সেই কমিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানকেও অবশ্যই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত হতে হবে। সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হলো দাঙ্গা বাধলে যে গ্রুপের লোকেরা এই আইনের সুবিধে পাবেন তার প্রত্যেকেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তি। কিন্তু শিয়া-সুন্নী, মুসলিম-খৃস্টানে দাঙ্গা বাধলে 'গ্রুপ' শব্দটি কিভাবে বিচার্য হবে তার উল্লেখ নেই, সঙ্গতভাবেই এ প্রশ্নটি উত্থাপন করেন অসীম মিত্র।

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত জয়দীপ রায়। মঞ্চে রয়েছেন শমীক ভট্টাচার্য, বি পি সাহা , অসীম মিত্র ও দিলীপ ঘোষ।

বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'এই বিলের উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের স্বকীয়তা, স্বাভিমান, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা।' সভাপতির ভাষণে বাণীপদ সাহা হিন্দু সমাজকে একযোগে এই বিলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আহ্বান জানান। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের দক্ষিণবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক দিলীপ ঘোষ জানান, আগামীদিনে এই বিলের বিরুদ্ধে হিন্দুদের সচেতনতা আনতে রাজ্য জুড়ে প্রচারে নামবেন তাঁরা। জয়দীপবাবু আশার কথা শুনিয়ে যান যে অ্যাডভাইসরি কাউন্সিল তাদের কার্যবিবরণীতে ন্যাশনালিস্ট ল' ইয়ার্স ফোরামের পাঠানো এই বিলের একশোটি সংশোধনীর মধ্যে ৩৯টি মানবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে; কিন্তু তাদের এই মৌখিক প্রতিশ্রুতি কতটা বাস্তবায়িত হবে তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন তিনি।

ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে মঞ্চে রয়েছে (বাঁ দিক থেকে) লেঃ জেঃ এস কে সিং, দীনেশ চন্দ্র সিংহ, লালকৃষ্ণ আদবানী, রমণ সিং, ডাঃ হর্ষবর্ধন।

'৫৩ সালের পূর্বাবস্থা কোনওভাবেই ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না কাশ্মীরকে : আদবানী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। জম্মু-কাশ্মীরকে ১৯৫৩ সালের পূর্বেকার অবস্থা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে। ১৯৫৩ সালের পূর্বে জম্মু-কাশ্মীরে পৃথক প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি ও পতাকা ছিল। সুপ্রীম কোর্ট, ক্যাগ, নির্বাচন কমিশনের মতো দেশের সংস্থাগুলির কোনও অধিকার ওই রাজ্যে ছিল না। জম্মু-কাশ্মীরে যেতে গেলে পারমিট নিয়ে যেতে হোত। সংবিধানের ৩৭০ ধারা বলে এইসব অধিকার জম্মু-কাশ্মীরের ছিল। শ্যামাপ্রসাদের আত্মবলিদানের পরই এইসব রদ হয়। ভারতের অখণ্ডতা রক্ষায় শ্যামাপ্রসাদ প্রথম শহীদ। তাই ১৯৫৩ সালের পূর্বের অবস্থা ফিরিয়ে দিলে বাকি কি থাকলো? এজন্যেই ৩৭০ ধারা বাতিলের দাবী বারবার আমরা জানিয়ে আসছি। গত ১০ জুলাই কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১১০তম জন্মদিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় এই বক্তব্য রাখেন ভারতের প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানী। গত কয়েক বছর ধরে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রিসার্চ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিবস পালন করা হয়ে আসছে। এদিনের অনুষ্ঠানে মঞ্চে ছিলেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী রমন সিংহ, জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন রাজ্যপাল লেফট্যানেন্ট জেনারেল এস কে সিং, রামনাথ কোবিদ, রাজ্য বিজেপি সভাপতি রাহুল সিনহা প্রমুখ।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রথমে সংস্কার ভারতীর কমল বন্দ্যোপাধ্যায় 'বন্দেমাতরম' গীতটি পরিবেশন করেন। ফাউন্ডেশনের সম্পাদক ডাঃ হর্ষবর্ধন সকলকে স্বাগত জানান। ভীড়ে ঠাসা হলে শ্রী আদবানী পশ্চিমবঙ্গে শাসক পরিবর্তনকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মন্তব্য করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সরকারকে স্বাগত জানান। সেইসঙ্গে তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশে যাওয়ার কথা। শুনেছি এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও তাঁর সঙ্গী হবেন। বাংলাদেশের হিন্দুরা যাতে সুরক্ষিত থাকেন, সেটা দেখতে হবে। আর বাংলাদেশ থেকে যাতে অনুপ্রবেশ বন্ধ হয় সেটা দেখাও খুব প্রয়োজন। আশা করি বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গে ওঁরা এই দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। তাঁর কথা— এদেশে এখনও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে বংশানুক্রমিক শাসনের প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। এদেশে ৪৫০টি নামীদামী প্রকল্প রয়েছে যাদের নামকরণ হয়েছে জহওরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী কিংবা রাজীব গান্ধীর নামে। প্রশ্ন হলো, দেশে কি আর কোনও গুণীজন নেই?

দেশভাগের সময়কার স্মৃতিচারণ করে শ্রী আদবানী বলেন, হিন্দুবহুল করাচির স্কুলের ছাত্ররা সেদিন বিতরণ করা 'মিঠাই' নেয়নি। পাঠানকোটে এক বিধবা বৃদ্ধাকে সংবর্ধনা জানাতে গিয়ে তিনি অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। ওই বৃদ্ধার স্বামী কাশ্মীরে তেরঙা-পতাকা তুলতে গিয়ে নিহত হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ৫৬১টি রাজ্যের ভারতভুক্তিতে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের দূরদর্শিতা ও অসাধারণ কর্মদক্ষতার কথা তুলে ধরেন। সেইসঙ্গে তাঁর সহকর্মী ভি পি মেনন-এর সহযোগিতার কথাও। একমাত্র দেশীয় রাজ্য যা পণ্ডিত নেহরু স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দায়িত্ব নিয়েছিলেন, সেই জম্মু-কাশ্মীর আজও ভারতের গলার কাঁটা।

তিনি বলেন, অনুষ্ঠানের আগে শ্যামাপ্রসাদের বসতবাড়ীতে গিয়ে তাঁর অনেক পুরনো কথা মনে পড়েছে। ১৯৫৩-র এপ্রিলে কানপুরে ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রথম রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে রাজস্থানের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি এসেছিলেন এবং সেখানেই প্রথম ডঃ শ্যামাপ্রসাদকে দেখার তাঁর সৌভাগ্য হয়েছিল। শ্যামাপ্রসাদের আত্মবলিদানকে সার্থক করার জন্য তিনি সকলকে আহ্বান জানান। সাংসদ তথা ফাউন্ডেশনের নির্দেশক তরুণ বিজয় তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে শ্যামাপ্রসাদ চর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। মাওবাদী সন্ত্রাসে জর্জরিত হয়েও ছত্তিশগড়ে গত কয়েক বছরে যে উন্নয়নের কাজ হচ্ছে এবং তাতে কীরকম সাফল্য পাওয়া যাচ্ছে তার কথা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী রমন সিং। তিনি বলেন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিজেপি যে এখন ছত্তিশগড়ে সর্বস্তরের নির্বাচনে ৯০ শতাংশ সাফল্য পাচ্ছে, উন্নয়নের সেটাই প্রমাণ। যে মাওবাদকে চীন বাতিল করে দিয়েছে, এখানকার মাওবাদীরা তারই 'ঝুনঝুনি' বাজাচ্ছে। এটা সফল হবে না। এই প্রসঙ্গে ছত্তিশগড়ের ভৌগোলিক অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, শুধু বস্তার জেলাটি ৪০ হাজার বর্গ কিলোমিটার যা কেরলের থেকে বড় এবং পাহাড় ও ঘনজঙ্গলে পরিপূর্ণ।

অন্যান্য বক্তার মধ্যে ছিলেন এস কে সিংহ, রাহুল সিনহা, অনুষ্ঠানের সভাপতি ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ। 'পশ্চিমবঙ্গ' রাজ্যের নাম পরিবর্তনের প্রয়াসকে বাংলার ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র বলে রাজ্য বিজেপি সভাপতি বর্ণনা করেন। কমিউনিস্টরা যে কাজ শুরু করেছিল এখনও সেই অপচেষ্টা অব্যাহত বলে তিনি সতর্ক করে দেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিদ্যার্থী পরিষদের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রিসার্চ ফাউন্ডেশনের রাজ্য শাখার সভাপতি অধ্যাপক রবি রঞ্জন সেন। ফাউন্ডেশনের পক্ষে ধন্যবাদ জানান স্বস্তিকা সম্পাদক ডঃ বিজয় আঢ্য।

কেন্দ্রে কংগ্রেসী সরকার মানেই আর্থিক কেলেঙ্কারি

গূঢ়পুরুষের কলম

আর প্রায় একমাস পরেই ভারতের ৬৫তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হবে। দেশের রাজনীতিক বুদ্ধিজীবীরা কাটাছেঁড়া করবেন স্বাধীনতার মানে খুঁজতে। এই স্বাধীনতা 'ঝুটা' না 'সাচ্চা' চলবে তাই নিয়ে বিতর্ক। যেমন, দুর্নীতি, কালো টাকা, লোকপাল নিয়োগ ইত্যাদি নিয়ে শেষ কথা কে বলবে? নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা নাকি নাগরিক সামাজের প্রতিনিধিরা? বিতর্ক চলছে...চলবে। এই চাপান-উতোরের মধ্যে হারিয়ে যাবে দেশের সেই সব আর্থিক কেলেঙ্কারির ঘটনা এবং অপরাধীরা যারা স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। এই বিপুল পরিমাণ টাকা চুরি না হলে আজ ভারত বিশ্বের 'সুপার পাওয়ার' হতে পারতো। ভারতে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অপুষ্টি থাকতো না। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখটি ভারতের স্বাধীনতা দিবস হিসাবে চিহ্নিত। তার ঠিক এক বছর পর অর্থাৎ ১৯৪৮ থেকে ২০১০, দেশের সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত টাকা তছরূপ বা চুরি করার বড় বড় কেলেঙ্কারির হিসাব নিলে মাথা ঘুরে যাবে। এই সময়ের মধ্যে মোট ৩৮টি বড় বড় আর্থিক কেলেঙ্কারিতে লুঠ হয়েছে ৯১০, ৬০৩, ২৩৪, ৩০০,০০০ টাকা। মার্কিন ডলারের হিসাবে ২০.২৩ ট্রিলিয়ন ডলার। আর এই লুঠ হয়েছে রাজনীতিক---জনপ্রতিনিধিদের মদতে। অবাক লাগে যখন শুনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে, কালো টাকা বাজেয়াপ্ত করার দাবিতে আন্দোলন করার অধিকার যোগগুরু রামদেব বা সমাজকর্মী আন্না হাজারের নেই! কারণ, তাঁরা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নন। আমজনতা বা নাগরিক সমাজের নাকি অধিকারই নেই দেশের মন্ত্রী, আমলা এবং তাদের সাঙাতদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ার। বিশ্বাস হয় না যখন দেখি দেশের 'জরুরী অবস্থা' ঘোষণার দিনটিতে জয়প্রকাশ নারায়ণের ছবিতে যাঁরা মালা দেন সেই নেতারাই গর্জন করছেন নির্বাচিত সাংসদরাই একমাত্র সিদ্ধান্ত নিতে পারেন দুর্নীতি দমনে 'লোকপালের' ক্ষমতা কতটা থাকবে। আমজনতা নয়। তাঁরা ভুলে যান যে প্রয়াত জয়প্রকাশজী যখন ইন্দিরা গান্ধীর ঘোষিত জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন তখন তিনি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ছিলেন না। দেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবেই তিনি প্রতিবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

স্বাধীনতার পর সরকারি কোষাগার থেকে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা লুঠ যারা করেছিল সেই লুঠেরাদের মদত দিয়েছে তথাকথিত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাই। সমাজের শ্রদ্ধেয় অনির্বাচিত ব্যক্তিরা নয়। ভারতে প্রথম যে আর্থিক কেলেঙ্কারি নিয়ে হৈচৈ হয় তা হচ্ছে ১৯৪৮ সালে জওহরলাল নেহরু মন্ত্রিসভার নির্দেশে বৃটেন থেকে জিপ গাড়ি ভারতে আমদানি করাকে কেন্দ্র করে। মোট ৮০ লক্ষ টাকা চুরি হয়। মনে রাখতে হবে ১৯৪৮ সালে ৮০ লক্ষ টাকার দাম এখনকার ৮০০ কোটি টাকা। এরপর থেকেই লুঠের টাকার অঙ্ক ধীরে ধীরে বেড়েছে। যেমন, ১৯৫৭ সালে হরিদাস মুন্দ্রা আর্থিক কেলেঙ্কারিতে লুঠ হয় ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। তেজা ঋণ কেলেঙ্কারিতে (১৯৬০) ২২ কোটি। কুয়েত পেট্রোপণ্য আমদানি কাণ্ডে (১৯৭৬) ২ কোটি ২ লক্ষ। এইচ ডি ডব্লু ডিল (১৯৮৭) থেকে দালালি বাবদ লুঠ হয় ২০ কোটি। ওই বছরেই (১৯৮৭) বফর্স কামান কেনার দালালিতে গায়েব হয় ৬৫ কোটি টাকা। সেন্ট কিট্‌স জালিয়াতিতে (১৯৮৯) উড়ে যায় ৯ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা। এয়ারবাস বিমান আমদানি কেলেঙ্কারিতে (১৯৯০) চুরি হয় ২ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। এই সময় পর্যন্ত সরকারি কোষাগারের লুঠেরারা তেমন বড় দাঁও মারেনি। প্রথম বড় লুঠের ঘটনা ঘটে ১৯৯২ সালে সিকিউরিটি কেলেঙ্কারিতে। চুরি হয়ে যায় ৫০০০ কোটি টাকা। ওই বছরেই (১৯৯২) ব্যাঙ্কের তহবিল থেকে গোপনে ১৩০০ কোটি টাকা সরানো হয়। চিনি আমদানি কাণ্ডে (১৯৯৪) লুঠ হয় ৬৫০ কোটি টাকা। প্রয়াত কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও সরকারকে বাঁচাতে ১৯৯৫ সালে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সাংসদদের কমপক্ষে ২ কোটি টাকা করে ঘুষ দেওয়া হয়। বিহারে ১৯৯৬ সালে লালুপ্রসাদ যাদব এবং তাঁর সাঙাতরা প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে। বিদেশ থেকে ইউরিয়া সার আমদানির (১৯৯৬) নামে চুরি হয় ১৩৩ কোটি টাকা। এরপর সি আর বি স্ক্যাম (১৯৯৭) ১০০০ কোটি টাকা। প্ল্যানটেসন কোম্পানী কেলেঙ্কারি (১৯৯৯) ২,৫৬৩ কোটি টাকা। স্টক মার্কেট স্ক্যাম (২০০১) ১,১৫,০০০ কোটি টাকা। তেলেগি স্ট্যাম্প পেপার কেলেঙ্কারিতে (২০০৩) গায়েব হয় ৩০,০০০ কোটি টাকা।

সাম্প্রতিককালের বড় কেলেঙ্কারি (কোটি টাকায়)	
স্করপিন সাবমেরিন আমদানি (২০০৫)	১৮,৯৭৮
পাঞ্জাব সিটি সেন্টার নির্মাণ (২০০৬)	১,৫০০
পুণের হাসান আলি কেলেঙ্কারি (২০০৮)	৫০,০০০
সত্যম কেলেঙ্কারি (২০০৮)	১০,০০০
সেনা রেশন কেলেঙ্কারি (২০০৮)	৫০০০
টুজি স্পেকট্রাম কাণ্ড (২০০৮)	১,৭৬,০০০
চাল রপ্তানী প্রতারণা কাণ্ডে (২০০৯)	২,৫০০
ওড়িশা খনি কেলেঙ্কারিতে (২০০৯)	৭,০০০
মধু কোড়া খনি কাণ্ডে (২০০৯) চুরি হয়	৪,০০০
কমনওয়েলথ গেমস্ কেলেঙ্কারি	৪০,০০০

সাম্প্রতিককালে সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে যে সব বড় বড় লুঠ হয়েছে তা এই রকম। স্করপিন সাবমেরিন আমদানি (২০০৫) কাণ্ডে ১৮,৯৭৮ কোটি টাকা। পাঞ্জাব সিটি সেন্টার নির্মাণ প্রকল্প (২০০৬) ১,৫০০ কোটি। পুণের হাসান আলি খান কর ফাঁকি কেলেঙ্কারি (২০০৮) ৫০,০০০ কোটি। সত্যম কেলেঙ্কারি (২০০৮) ১০, ০০০ কোটি। সেনা রেশন কেলেঙ্কারি (২০০৮) ৫০০০ কোটি। টুজি স্পেকট্রাম কাণ্ড (২০০৮) ১,৭৬,০০০ কোটি টাকা। চাল রপ্তানী প্রতারণা কাণ্ডে (২০০৯) ২,৫০০ কোটি। ওড়িশ্যা খনি কেলেঙ্কারিতে (২০০৯) ৭,০০০ কোটি টাকা। মধু কোড়া খনি কাণ্ডে (২০০৯) চুরি হয় ৪,০০০ কোটি এবং কংগ্রেস নেতা সুরেশ কালমাদির দলবল কমনওয়েলথ গেমস্‌কে সামনে রেখে লুঠ করেছে প্রাথমিক হিসাবেই ৪০,০০০ কোটি টাকা। এরপরেও কীভাবে বলা যায় যোগগুরু রামদেব নন, পেশাদার রাজনীতিকরাই যথার্থ জনপ্রতিনিধি? দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের অধিকার একমাত্র তাঁদেরই আছে!

রাজ্য রাজনীতি

প্রবল গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার সিপিএম

নিশাকর সোম

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম কাণ্ড পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-নেতৃত্ব অর্থাৎ বুদ্ধ-বিমান-নিরুপম-গৌতম-বিনয়-কে তাড়া করছে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-জঙ্গলমহল- নেতাই নিয়ে সিপিএমের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সিপিএমের রাজ্য-নেতৃত্বকে নির্বাচনী বিপর্যয়ের জন্য দায়ী করেছে। এখন সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজনৈতিক সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত রাজ্য-নেতৃত্বকে মানতে বাধ্য করছে। সিপিএমের কেন্দ্রীয় নীতির প্রতিফলন সিপিএম পরিচালিত কৃষক সভার সর্বভারতীয় কাউন্সিল সভায় পড়েছে। সেখানে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লার বক্তব্যই মূলত গৃহীত হয়েছে। এই কাউন্সিল সভার আগে রেজ্জাক মোল্লা হান্নান মোল্লাকে সঙ্গে নিয়ে সিপিএমের কেন্দ্রীয় তথা কৃষক সভার নেতা বরদারাজনের সঙ্গে আলোচনা করেন।

এর ফলেই কৃষক সভার সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে— (১) পশ্চিমবঙ্গে কৃষক- সভা ধনী কৃষকদের স্বার্থ দেখে। স্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের কৃষক-নেতৃত্ব বস্তুত বর্ধমান গোষ্ঠীর হাতে। যারা নিজেরাই ধনী কৃষকদের অংশ। এই কথা কিন্তু সিপিএম-এর প্রথম সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত পি সুন্দরাইয়া পার্টির সপ্তম কংগ্রেসে এবং তাঁর কৃষক দলিলে বলেছিলেন, 'অ্যাপোলজিস ফর রিচ পেজেন্টস।' সপ্তম পার্টিকংগ্রেসে খেতমজুর সংগঠন করার প্রস্তাবকে প্রয়াত সাহেদুল্লাহের নেতৃত্বে বাধা দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ-রাজ্যে খেতমজুরদের সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে তিন ফসলি-দু' ফসলি জমি নেওয়া গুরুতর ভুল হয়েছিল। কৃষক সভার নেতা গরীব কৃষক-খেতমজুরদের মধ্য থেকেই তুলে আনতে হবে। রেজ্জাক মোল্লা-হান্নান মোল্লাদের উপর এ-রাজ্যের কৃষক ফ্রন্টের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি যে দলিল গ্রহণ করেছে তার মূল কথা হলো— 'বুদ্ধবাবুর মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণের দিন প্রথম 'অনারেবল ভিজিটার' রতন টাটা এবং তারপরই শিল্পায়নের ঢেউ সৃষ্টি করে পার্টি সংগঠনকে ধনিকশ্রেণী-মুখী করা হয়েছে। ফলে রাজ্যের বেশিরভাগ পার্টির সদস্য ধনিক-বণিক-প্রমোটার অবলম্বিত পরগাছায় পরিণত হয়ে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়েছে। এর বিরুদ্ধে রাজ্য-নেতৃত্ব নিশ্চুপ ছিল। কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে এ-রাজ্যের নেতৃত্বকে আত্মসমালোচনা করতে হবে। কারণ নিচের তলার কর্মীদের পরিচালনা করার দায়িত্ব ছিল তাদের। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব-এর সঙ্গে সিপিএমের রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য তথা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মদন ঘোষ সহমত পোষণ করেন। তাই তিনি পার্টির দৈনিক মুখপত্রে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক লিখেছেন, বুদ্ধ-রতন টাটার সাক্ষাৎকার থেকে পার্টির ভুল পথে চলার শুরু। তিনি আত্মসমালোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে লিখেছেন— ''রাজ্যপার্টি ধনিক শ্রেণীর স্বার্থবাহী হয়ে গরীব, কৃষক, ভূমিহীনদের দিক থেকে সরে গেছে। এ ত্রুটি দূর করতে হবে। বামফ্রন্ট সরকারের ভাল কাজ এই ঘটনায় ডুবে গেছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষাক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা স্বীকার করেছে। তাঁরা আরও বলেছেন যে বামঐক্যকে ছিন্নভিন্ন করা হয়েছে।

এদিকে রাজ্যনেতৃত্ব দীপক সরকার সুশান্ত ঘোষের 'মারদাঙ্গা' লাইনের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছেন। এর জবাবে দীপক-সুশান্ত গোষ্ঠী বলেছেন, রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত মোতাবেকই সব করা হয়েছে।

রাজ্য-পার্টির মধ্যে রেজ্জাক-কান্তি গাঙ্গুলি-এর নেতৃত্বে তীব্র আন্তপার্টি সংগ্রামের ঝড় তোলা হয়েছে। এই ঝড়ে 'সাদাচুলের' নেতার বদলে 'চাষার ঘরের কালোচুলের' নেতারা কি আসতে পারবে? এই সবই আগামীদিনে বিভিন্ন স্তরের সম্মেলনের মধ্যেই সিদ্ধান্ত হবে।

এ-প্রসঙ্গে বলা যায় সিপিএম পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা নেতৃত্ব (পড়ুন দীপক-সুশান্ত) জেলা পার্টি চিঠি প্রকাশ করে বলেছে— নির্বাচনে রাজনীতি ছিল না। মাও-সিপিএম এক হয়ে গেছলো, নেতাদের নানা উক্তি ক্ষতি করেছে। এই কথা মদন ঘোষও তাঁর লেখায় বলেছেন। মদনবাবুর বক্তব্য— এখনও কিছু নেতার ঔদ্ধত্য রয়েছে।

অপরদিকে তৃণমূল-কংগ্রেস জোট মন্ত্রিসভার কাজকর্মের ইতিবাচক দিক হলো— (১) গ্যাসে ১৬ টাকা ছাড়, (২) স্বাস্থ্যব্যবস্থা ঢেলে সাজানো। সর্বোপরি জঙ্গলমহল সম্পর্কে '' 'প্যাকেজ' ঘোষণা। যদিও ঘোষণা করা হয়েছে 'জঙ্গলমহল অস্ত্রহীন না-হওয়া পর্যন্ত যৌথবাহিনীকে সরানো হবে না।' কিন্তু নতুন মুখ্যমন্ত্রীর এইসব কাজের মধ্যে বহু সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিবকে বদল করে দিল্লি থেকে আনা লোককে স্বাস্থ্য সচিব করা। এর ফলে সচিবস্তরে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। চিকিৎসকদের মধ্যেও ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে। এখানে বামফ্রন্ট জমানার মতো 'পছন্দমাফিক' আমলা বসানো হচ্ছে।

শিক্ষাক্ষেত্রেও হুড়মুড়িয়ে কাজ করা হচ্ছে। হঠাৎ করে বিদ্যালয় শিক্ষকমন্ত্রীকে কৃষিমন্ত্রী করা হলো। উচ্চশিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, তাঁকে বিদ্যালয় শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হলো। এরপরই মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নতুন চেয়ারম্যান করা হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-এর লাইব্রেরি ও ইনফরমেশন সায়েন্সের অধ্যাপিকা চৈতালী দত্তকে। বর্তমান সভাপতির মেয়াদ ছিল ২০১৪ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হলো মানিকলাল ভট্টাচার্যকে। তিনি তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য এবং তৃণমূলের শিক্ষা সেলের আহ্বায়ক। এছাড়া অধ্যাপক মুক্তিনাথ চ্যাটার্জিকেও বসানো হয়েছে। তিনিও তৃণমূলের লোক। একেবারে সিপিএমের কায়দায় 'দলতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার একই প্রয়াস।

সম্প্রতি আর একটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। এ রাজ্যের প্রাক্তন পুলিশ অফিসার নজরুল ইসলাম বামফ্রন্টে সরকার-বিরোধী হওয়ার দরুন দিল্লি চলে যান। তাঁকে রেলমন্ত্রী হিসাবে মমতা ব্যানার্জী রেলের নিরাপত্তার দায়িত্বে আনেন। এরপর মমতা ব্যানার্জী মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তাঁকে (নজরুল) এ- রাজ্যে ফিরিয়ে আনেন। নজরুলের আশা ছিল পুলিশ বিভাগেই পোস্টিং হবে। কিন্তু তাঁকে কম্পালসারি ওয়েটিং লিস্টে রেখে দিয়ে সম্প্রতি তাঁকে জানানো হয়েছে যে, 'তাঁকে ওয়াকফ বোর্ডের দায়িত্ব দেওয়া হবে।' মমতা ব্যানার্জী নয়, মহাকরণের এক অফিসার এ কথা জানিয়েছেন। ক্ষোভে-দুঃখে নজরুল এইপদ গ্রহণ না করে একটি চিঠি লিখে চলে গেছেন!

এছাড়া প্রতিটি কাজে মুখ্যমন্ত্রীর পাশে কলকাতার মেয়র শোভন চ্যাটার্জী- এর উপস্থিতি তৃণমূলের সাধারণ কর্মীদের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে। তাঁরা চাইছেন— সুষ্ঠু নেতৃত্বের জন্য যৌথ কর্মসূচী এবং কমিটি গঠন করে কাজ করা উচিত। এমনকী রাজ্যসভার প্রার্থী মনোনয়ন নিয়েও প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটা হলো— এতোদিন যাঁরা সিপিএম-কে উৎখাতের লড়াইতে জান-প্রাণ দিয়ে লড়াই করেছেন— তাঁরা উপযুক্ত মর্যাদা পাচ্ছেন না?

এই সময়

ঝুলির বেড়াল বেরোল

ঝুলি থেকে বেড়াল বার করলেন বিতর্কিত পাক-বিজ্ঞানী আব্দুল কাদের খান। একটি গোপন চিঠি ফাঁস করে তিনি দাবী করেছেন যে উত্তর কোরিয়া পাক-সেনাবাহিনীকে কোটি কোটি ডলার দিয়ে নিউক্লিয়ার প্রযুক্তি কিনেছে। আর সেই নিউক্লিয়ার প্রযুক্তি দিয়ে তারা তৈরি করেছে বিধ্বংসী পরমাণু বোমা এবং উত্তর কোরিয়ার সেই ঘুষ-প্রাপকদের তালিকায় রয়েছে স্বয়ং পাক সেনা-প্রধান জেনারেল জাহাঙ্গির কারামাত। গুরুতর সংশয় তৈরি হয়েছে— নিউক্লিয়ার প্রযুক্তি দেওয়ার পাশাপাশি ভারতকে ঘায়েল করতে উত্তর কোরিয়াকে কাজে লাগাছে না তো পাক সেনাবাহিনী?

উন্মোচিত কংগ্রেসী ষড়যন্ত্র

বইটির নাম ছিল 'আর এস এস কা ষড়যন্ত্র, ২৬/১১?' গোদা বাংলায় অর্থ দাঁড়ায়, পাক-মদতে সংঘটিত ২০০৮-এর ২৬ নভেম্বরে মুম্বাইতে জঙ্গিদের তাণ্ডবলীলা কি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ষড়যন্ত্র? অবশ্য ষড়যন্ত্রে পাক-মদতের কথাটা বইটির লেখক ও একটি উর্দু পত্রিকার সম্পাদক আজিজ বার্নি সন্তর্পণে এড়িয়ে গিয়ে আর এস এসের ওপর দায় চাপিয়েছেন। সূর্য পশ্চিমদিকে উঠলেও সম্ভবত ভারতবাসী এতটা আশ্চর্য হতেন না যতটা না বার্নির লেখায় তাঁরা হয়েছেন! সেইসঙ্গে অবশ্য দিগ্বিজয় সিংয়ের মতো কংগ্রেসী ফড়ে গত ডিসেম্বরে বইটার উদ্বোধন করায় নোংরা ও নির্লজ্জ (এর চেয়ে নগ্ন ভাষা প্রতিবেদক ব্যবহার করতে অপারগ) কংগ্রেসী ষড়যন্ত্র জনসমক্ষে উন্মোচিত হয়েছিল পূর্বেই।

পরবর্তীকালে এনিয়ে আর এস এসের স্বয়ংসেবকরা মুম্বাই হাইকোর্টে অভিযোগ দায়ের করলে নিঃশর্তে ক্ষমা চেয়ে নেন বার্নি। কিন্তু মিথ্যার বেসাতি করে যে জঘন্য ষড়যন্ত্রে সামিল হয়েছিলেন বার্নি, সঙ্গত কারণেই তাঁকে ক্ষমা করতে চাননি স্বয়ংসেবকরা। এবার বার্নির সমর্থনে আর কেউ না, আইনজীবী হিসেবে এগিয়ে এলেন কংগ্রেসী মন্ত্রী কপিল সিবাল। যিনি দিগ্বিজয়ের মতোই আরেক কংগ্রেসী ফড়ে, নেহরু পরিবারের উত্তরসূরীদের তেল দিতে সঙ্ঘ-বিরোধিতাই একমাত্র সম্বল। আর এস এসের বিরুদ্ধে গান্ধী-নেহরু পরিবারের ষড়যন্ত্রের পর্দা সরতে যেটুকু বাকি ছিল দিগ্বিজয়ের পর সিবাল সেটুকুও সরিয়ে দিলেন।

নেই নম্বর, রিপোর্ট কার্ডও

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এসে প্রেসিডেন্সী কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উন্নীত হয়েছে প্রায় ১৬ মাস হলো। তবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সাবেকী কেতা তারা ছাড়তে পারেনি। সরকারি স্তরে প্রেসিডেন্সীর মানোন্নয়নের চেষ্টা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাবেকী প্রথা থেকে বেরিয়ে অত্যাধুনিকতার পথে হাঁটতে শুরু করল। ১১ জুলাই থেকে আরম্ভ হওয়া চলতি শিক্ষাবর্ষেই সেমিস্টারভিত্তিক 'গ্রেড-ক্রেডিট' পদ্ধতিতে পরীক্ষার প্রকাশিত ফলাফলে থাকবে না নম্বর, কেবল ১০ পয়েন্ট স্কেলে গ্রেড দেওয়া হবে। থাকছে না রিপোর্ট কার্ডের বালাইও। চূড়ান্ত পরীক্ষার শেষে গ্রেড-প্রাপ্ত মার্কশিট-টিই হবে ছাত্র কিংবা ছাত্রীটির পরবর্তী পর্যায়ে উত্তরণের সম্বল।

বাড়ছে সাংসদ-তহবিলের টাকা

সাংসদদের মাইনে বৃদ্ধিতে সরকারের প্রবল আপত্তি থাকলেও, এম পি ল্যাডের (সাংসদদের উন্নয়ন তহবিলের) টাকা একলপ্তে আড়াইগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হলো। ইতিপূর্বে নিজের এলাকার উন্নয়নের জন্য বার্ষিক ২ কোটি টাকা থেকে ৩ কোটি বাড়িয়ে ৫ কোটি করা হয়েছে। জিনিসপত্রের দর-দাম বছর বছর লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সত্য, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এলাকায় সাংসদদের কাজকর্মও কমছে, অর্থের অপ্রতুলতার অভিযোগে। কিন্তু এরপরেও সাংসদ উন্নয়ন তহবিলের টাকার সন্ধান কি মিলবে এলাকার উন্নয়নে? মাইনের ঘাটতি নিয়ে যেসব সাংসদ সরব হয়েছিলেন, উন্নয়ন তহবিলের টাকা দিয়ে তাঁরা সেই ঘাটতিটুকু পুষিয়ে নেবেন না তো? আশঙ্কাটা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।

৯০,০০০ কোটির সম্পত্তি

কী মুশকিল, অত টাকার সম্পত্তি দেখে দুর্নীতি ভেবে আঁতকে উঠলে চলে? একি আর ভুঁইফোড় রাজনীতিবিদ পেলেন যে হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করবে! এ হলো কেরলের তিরবন্তপুরমের পদ্মনাভ স্বামী মন্দির, বহু প্রাচীন। মন্দির গর্ভে সম্প্রতি যে বিপুল পরিমাণ সোনার গয়না, সোনার মুকুট, হীরে ও অন্যান্য রত্নভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তার মূল্য নেহাৎ ৯০,০০০ কোটির কম হবে না বলেই সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছে। ১৮ শতকে নির্মিত এই মন্দিরটির স্থাপত্য-মূল্য বহু কোটি টাকা। রাজ্যের বার্ষিক বাজেটের প্রায় তিনগুণ বেশি সম্পত্তি রক্ষিত আছে মন্দির-গর্ভে। জনৈক রাজনীতিকের মন্তব্য---'অবশ্য কেরলের প্রতিবেশি রাজ্য তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী (পড়ুন করুণানিধি, কানিমোজি প্রমুখ)-র পরিবারের কাছে গচ্ছিত কালো টাকার কাছে কোথায় লাগে এ সম্পত্তি!' যাই হোক, মন্দিরের মালিকানা এবং এর ভবিষ্যত নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাজ্য-প্রশাসন।

ভাগ্য ফেরাতে

আপনার কি মন্দ ভাগ্য? নাম পাল্টে দেখতে পারেন। ফিরিলেও ফিরিতে পারে ভাগ্য, মানে সুপ্রসন্ন হতে পারেন ভাগ্য-দেবতা। তামিলনাড়ুর আবহ অনেকটা এরকমই। গত বছর ১ এপ্রিল থেকে এবছরের ৩১ মার্চ অবধি ডিরেক্টরেট অব্ স্টেশনারি অ্যান্ড প্রিন্টিং নাম-পরিবর্তনের আবেদন নিয়ে জমা পড়া আবেদন-পত্রের সংখ্যা ৪৪,৩৪৫। ইতিপূর্বেও বিগত দু'টি আর্থিক বছরে নাম পরিবর্তনের আবেদন জমা পড়েছিল ২৯,৭৩০ (২০০৮-০৯ বর্ষ) এবং ৩২,৯৬৩টি (২০০৯-১০ বর্ষে)। বোঝাই যাচ্ছে এহেন আবেদনকারীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। পাল্লা দিয়ে এজন্য আয় বাড়ছে রাজ্যেরও। ২০০৮-০৯ বর্ষে আয় ছিল ১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা, ২০০৯-১০ বর্ষে তা হলো ১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। সুতরাং নাম পাল্টে তামিলনাড়ুবাসীর ভাগ্য ফিরুক, আয় বাড়িয়ে আম্মা (জয়ললিতা)-র রাজ্যেরও ভাগ্য ফিরুক। তাঁরা বলতেই পারেন, 'যা দিনকাল (মানে করুণানিধি কানিমোজিদের যুগ) তাতে নিতান্ত দুর্ভাগা হয়ে লাভ কি?'

সংশোধনী

স্বস্তিকার গত ১১ জুলাই সংখ্যায় **'অসম বিধানসভার নির্বাচনী ফল : এক অশনি সংকেত'** শীর্ষক প্রবন্ধে ২০ পৃষ্ঠায় নীচের প্যারায় 'আবার অসমে'-র স্থানে 'আপার অসমে' পড়তে হবে।

সিঙ্গুর : কুর্সীর এপার ওপারের ফারাক অনেক

দেবব্রত চৌধুরী

তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচনের আগে যে দলীয় ইস্তাহার প্রকাশ করেছিলেন তা এক কথায় বলা যায় বামপন্থী ঘরনার নকল। ক্ষমতায় এলে আমরা এসব কিছু করবো এ সব হতে দেবো না ইত্যাদি। এবার সত্যি সত্যি তৃণমূলকে বাংলার আমজনতা পশ্চিমবঙ্গের মসনদে বসিয়েছে। যা যা নেত্রী দলীয় ইস্তাহারে বলেছিলেন তা করে দেখাতে হবে। ক্ষমতার বাইরে থাকলে যেহেতু দায়িত্ব কম থাকে, অনেক কথাই স্বচ্ছন্দে বলে হাততালি পাওয়া যায়, ক্ষমতায় আসীন হলে যে সে কথাগুলিই বোঝা হয়ে উঠে তা অচিরেই তিনি বুঝবেন। ক্ষমতায় আসার আগে তিনি প্রথমে আন্দোলন করেছিলেন—'কৃষি জমিতে শিল্প করা চলবে না'। তারপর বক্তব্য কিছুটা বদলে বলেছিলেন 'সিঙ্গুরে জমি বিক্রিতে অনিচ্ছুক চাষীদের জমি ফেরত দিতে হবে' অর্থাৎ চাষী যদি তার চাষযোগ্য জমি নিজ ইচ্ছায় শিল্প গড়তে বিক্রী করে তবে তাঁর বলার কিছু নেই। আপত্তি আছে যদি অনিচ্ছুক চাষীদের জমিতে শিল্প করা হয়। সিঙ্গুরে ৯৭১ একর জমির ৬০০ একর জমিতে টাটা তার "ন্যানো" মোটর কারখানার পরিকাঠামো গড়ে ছিলো। গোলমাল বাধলে বাদবাকি ৩৭১ একর জমি নিয়ে। যে জমি নির্দিষ্ট ছিল অনুসারী শিল্প স্থাপনের জন্য। যারা "ন্যানো" কারখানায় পার্টস মূলত সাপ্লাই করবে। অর্থাৎ যারা ন্যানো গাড়ী সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করবে। অবশেষে "ন্যানো" গাড়ী তৈরির পরিকল্পনা টাটা বাতিল করে গুজরাট চলে গেলো।

তৃণমূলী ইস্তাহারে বলা আছে ক্ষমতায় এলে ওই প্রায় ৪০০ একর জমি অনিচ্ছুক চাষীদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে। সিঙ্গুরে যতদূর জানি ৯৭১ একর জমির মালিক ছিলেন প্রায় ১৪০০০ জন। তার মধ্যে প্রায় ৭২ শতাংশ জমির মালিক নিজ ইচ্ছায় জমির দাম নিয়ে নিয়েছেন। গোলমাল বাদবাকি ২৮ শতাংশ জমির মালিকদের নিয়ে। যতদূর খবর পেয়েছি এই ২৮ শতাংশ জমির মালিকদের মধ্যে জমির মূল্য দেওয়ার সময় তাদের জমির মালিকানা স্বত্ত্ব সম্বন্ধে সঠিক দলিল পেশ করতে পারেননি যার জন্য জমির দাম নিতে পারেননি। ক্ষমতায় বসে এক মাসের মধ্যে প্রথমে 'অর্ডিন্যান্স' জারি করে ৪০০ একর সরকারি দখলে আনার ঘোষণা করলেন। টিভি মিডিয়া প্রচার করে হৈচৈ করে ফেললেন। কিন্তু এখন প্রবীণ সংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও কি করে দেশে নির্বাচিত বিধানসভা এড়িয়ে অর্ডিন্যান্স করতে গেলেন তা বোধগম্য নয়। যাই হোক, সাংবিধানিক নিয়মে তার অর্ডিন্যান্স টিকলো না।

তৃণমূলী ইস্তাহারে বলা আছে ক্ষমতায় এলে ওই প্রায় ৪০০ একর জমি অনিচ্ছুক চাষীদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে। সিঙ্গুরে যতদূর জানি ৯৭১ একর জমির মালিক ছিলেন প্রায় ১৪০০০ জন। তার মধ্যে প্রায় ৭২ শতাংশ জমির মালিক নিজ ইচ্ছায় জমির দাম নিয়ে নিয়েছেন। গোলমাল বাদবাকি ২৮ শতাংশ জমির মালিকদের নিয়ে। যতদূর খবর পেয়েছি এই ২৮ শতাংশ জমির মালিকদের মধ্যে জমির মূল্য দেওয়ার সময় তাদের জমির মালিকানা স্বত্ত্ব সম্বন্ধে সঠিক দলিল পেশ করতে পারেননি যার জন্য জমির দাম নিতে পারেননি।

তিনি বিধানসভা ১১ দিন এগিয়ে এনে এই বিলটি 'ধ্বনি' ভোটে পাশ করিয়ে নিলেন। এখন প্রশ্ন উঠেছে, সিঙ্গুরে জমি দিতে অনিচ্ছুক জমির মালিক তার পুরানো জমি ফেরত পাবে তো? তিনি তার জমির সঠিক মালিকানা সত্ত্বের প্রমাণ দিতে পারবে তো? কারণ বিলটি পাশ করার পর কাগজে দেখলাম গত দুদিনে মাত্র ১৮ জন মালিক সঠিক দলিল জমা দিতে পেরেছে। কিন্তু অনিচ্ছুক চাষীর সংখ্যা প্রায় ২৯০০ জন।

এরপর আসবে রাজ্য সরকারের নিজের অধিগৃহীত জমির মালিকানা আবার বদল করা হবে। ১৮৯৪ সালের আইন বদল করলেই সমস্যা মিটবে না। এই আইন কবে বদল হবে কেউ জানে না। কেন না শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রে ইতিমধ্যেই বলে রেখেছেন যে শিল্পের জন্য কোনও অধিগ্রহণই করা যাবে না। শিল্পপতিরা নিজেরা জমি কিনবেন। বলা বাহুল্য, এর অর্থ জমির দালালদের বাজার তৈরি হওয়া এবং চাষীদের সর্বনাশ হওয়া। কারণ সরকারি হস্তক্ষেপ এড়িয়ে জমি নিতে গেলে 'ফড়েবাজ' মদত নিতে হবে অধিগ্রহণ আইন বদলে অথবা না বদলে নিজের জমি 'অনিচ্ছুকদের' আবার ফিরিয়ে যদি দিতে চায় সেটা নিয়েও সমস্যা আছে। জমির চরিত্র ইতিমধ্যেই বদলে গিয়েছে। যে দাগে যে অনিচ্ছুকের জমি ছিল ওই দাগে হয়তো এর মধ্যে একটা সিমেন্টের মেঝে তৈরি হয়ে গিয়েছে। 'অনিচ্ছুক' ওই মেঝেটার দখল নিয়ে অন্যদের কাজ পণ্ড করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারবে না। এই 'অনিচ্ছুক'কে ওর মধ্যে কোনও একটা ফাঁকা জায়গায় জমি দিতে পারেন। কিন্তু সেটা করলেই 'ইচ্ছুক'রা মামলা করবেন আরও টাকা পাওয়ার জন্য। কারণ যে জমি নেওয়া হয়েছিল অনেক বিনিয়োগের পর সে জমির দাম এখন অনেকটাই বেড়ে গেছে। অধিগৃহীত জমির একাংশের যদি বর্ধিত দামের সুবিধা দেওয়া যায় অন্য অংশে কেন এদের তা দেওয়া যাবে না। এসব সমস্যা আছে শুধু সিঙ্গুরে নয়, সমস্যা আছে রাজারহাটেও। যেখানে অধিগৃহীত জমির মালিক অর্থাৎ ওয়ারিশকে ইস্তাহারে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে— তৃণমূল ক্ষমতায় এলে এরা সবাই বিক্রী হয়ে যাওয়া জমির জন্য আরও অনেক টাকা পাবেন। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় এসব সমস্যায় মানুষের ক্ষোভকে প্রথম দিকে বামফ্রন্টকে গালমন্দ করে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করবেন। কিন্তু সেটার একটা সময় ও সীমা আছে। পরে সামাল দিতে পারবেন না। তখন বামফ্রন্টের মতোই ভুল বাস্তবকে মোকাবিলা করতে হবে। তিনি যখন বারাসাত পেট্রাপোল হাইওয়ে সম্প্রসারণের জন্য যশোর রোডের দুপাশে জমি অধিগ্রহণ করতে যাবেন তখন তাঁকে তাদের মুখ দিয়েই উল্টো কথা বলতে হবে, যারা বামফ্রন্ট আমলে তৃণমূল নেতা হিসেবে ওই সম্প্রসারণের কাজে বাধা দিয়েছিলেন।

স্মরণ করিয়ে দিতে চাই পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কাছে কংগ্রেস দুর্নীতিবাজ, বামফ্রন্ট ঠকবাজ এবং শেষপর্যন্ত তৃণমূল ধাপ্পাবাজ হবে না তো? তখন কিন্তু পশ্চিমবাসী যেভাবে কংগ্রেস থেকে সরে গিয়েছে, বামফ্রন্টকে হাটিয়ে দিয়েছে, ঠিক তেমনি ভাবে তৃণমূলকে ডাস্টবিনে ফেলে দেবে না তো? কারণ কংগ্রেস-বামফ্রন্ট-তৃণমূল ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে আর এক দল আছে। হয়ত এখন ছোট, মনে হয় পূর্ণাঙ্গ হতে চলেছে শীঘ্রই।

অতিথি কলম

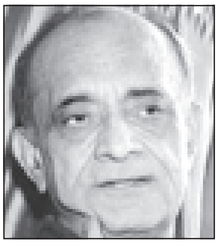

রাজিন্দর পুরী

সোনিয়া গান্ধী কি লুকোতে চাইছেন ?

গত ১৩ জুন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা দিল্লী গিয়েছিলেন। তিনি দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভারতের বৃহত্তম টেলিভিশন চ্যানেলে হুঙ্কার দেওয়া হলো— ‘‘জয়া কি সোনিয়ার সঙ্গেও দেখা করবেন?’’ চ্যানেলটি কি পেশাদারিত্বের চূড়ান্ত অভাবের জন্য নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করলো না কি সোনিয়া গান্ধীর গোপন গতিবিধির ষড়যন্ত্রের অন্যতম অংশীদার তারাও? ঠিক একইদিন সকালে মুম্বাইতে একজন প্রথিতযশা

সাংবাদিকের (জ্যোতির্ময় দে) হত্যার ঘটনায় সোনিয়া গান্ধীর দুঃখ-প্রকাশ করা এক প্রেস বিবৃতি জারি করা হয়েছিল। এই সমস্তই কি জনমানসে এক মায়াবী বিভ্রম তৈরি করার চেষ্টা যে শ্রীমতি গান্ধী দেশেই আছেন বলে অথচ তিনি তখন দেশে নেই। এটাই প্রথমবার নয় যে সোনিয়া গান্ধী নিঃশব্দে বিদেশে গেলেন এবং যেভাবে গেলেন সেটাকে সবার অলক্ষ্যে, চূড়ান্ত গোপনীয়ভাবে বলাই সঙ্গত। এই গোপনীয়তা কেন? কি কারণে শ্রীমতী গান্ধী তাঁর এই বিদেশ-ভ্রমণ সবার সামনে প্রকাশ করতে চান না?

তথ্য জানার অধিকার বলে জনৈক রমেশ ভার্মা প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের কাছে কংগ্রেস সভানেত্রী তথা ন্যাশনাল অ্যাডভাইসরি কাউন্সিল (এন এ সি)-এর চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধীর বিদেশ-ভ্রমণের যাবতীয় তথ্য জানতে চেয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় তথ্য আয়োগ (সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কাউন্সিল) এই দরখাস্তটিকে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তথ্য আয়োগের কমিশনার সত্যনন্দ মিশ্রের বক্তব্য, ‘‘এমনও হতে পারে যে সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রক কেন্দ্রীয় সরকারকে, বিগত দশ বছরে সোনিয়া গান্ধীর বিদেশ-ভ্রমণের কোনও খরচ তারা বহন করেনি বলে জানিয়েছিল।’’ দরখাস্তটি ২০১০ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়, তারা এটাকে পররাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে পাঠিয়ে দেয় ২০১০ সালের ১৬ মার্চ, সবশেষে সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রকের কাছে চিঠিটি আসে ২০১০ সালের ২৬ মার্চ। তবুও কেন্দ্রীয় সচিবালয় বলছে তারা এবিষয়ে কিছুই জানে না অথচ তথ্য জানার অধিকার আইনে আবেদনকারী এনিয়ে যাবতীয় তথ্য-প্রমাণাদি দিয়েছেন যেগুলো এতক্ষণ বলা হলো। তথ্য আয়োগের কমিশনার স্পষ্টতই বিষয়টা হাল্কাভাবে নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের সমালোচনা করেছেন। এনিয়ে সুনির্দিষ্ট অনুসন্ধানের পর বলা চলে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর উপযুক্ত মন্ত্রকের কাছ থেকে তথ্যটি গ্রহণ করেনি।

কংগ্রেস নেতৃত্ব মুখের রক্ত তুলে সুশীল সমাজের সভ্যদের স্বচ্ছতা দাবি করেন। তাঁদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে এনিয়ে তদন্তের কাজও শুরু হয়েছে। সরকারের কি একইরকম স্বচ্ছতা দেখানো উচিত ছিল না ভারতের সবচেয়ে ক্ষমতাবান রাজনীতিকটির ক্ষেত্রে যিনি শাসক ইউ পি এ জোট সরকার তথা জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদের সর্বোচ্চ পদে রয়েছেন? সরকারের উচিত এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া :

● শ্রীমতী গান্ধী কি সরকারি উড়ানে, নাকি ব্যক্তিগত বিমানে বিদেশ ভ্রমণ করেছিলেন? যদি উত্তর পরেরটি হয় তবে ব্যক্তিগত বিমানটি কার ছিল?

● জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ ও সংযুক্ত প্রগতিশীল জোট সরকারের প্রধান ঠিক কি উদ্দেশ্যে বিদেশ ভ্রমণ করেছেন?

● জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান কি বর্তমানেও ভ্রমণশীল? কোন কোন দেশ এবং শহরে তিনি ঘুরেছেন বা ঘুরবেন?

● এবং যখন তাঁরা এর মধ্যে রয়েছেনই, তখন আমাদের নীতিবাগীশ কংগ্রেস নেতৃত্ব এই প্রাচীন ও চিরকালীন প্রশ্নটার কি কোনও সদুত্তর দেবেন—

রাশিয়ান গুপ্তচর সংস্থা কেজিবি শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধীর পরিবার এমনকী তার মাকেও অর্থসাহায্য করেছে ১৯৭১ সাল থেকে— কেজিবি কমিশনের পক্ষ থেকে সোভিয়েত সরকারের এক আধিকারিক এই অভিযোগ জানানোর পরে এবং সোভিয়েত সরকারের সরকারি মুখপাত্র এই অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে নেওয়ার পরেও কেন কেন্দ্রীয় সরকার তা খণ্ডন করার কোনও চেষ্টাই করল না? এহেন অভিযোগকারীর ‘মার্জনা-ভিক্ষা’ কেন দাবী করল না সরকার এবং সেই অভিযোগকারী ও রাশিয়া সরকারের বিরুদ্ধে মানহানির মামলাই করতেই বা অপারগ হলো কেন তারা? অর্থ লুণ্ঠনকারী হাসান আলি এবং কংগ্রেস সভানেত্রীর রাজনৈতিক সচিব আহমেদ প্যাটেলের বৈঠকের ব্যাখ্যা সরকার এবং কংগ্রেস কেন দিচ্ছে না, যে বৈঠকের বিষয়টি তদন্ত চালিয়ে নিশ্চিত হয়েছে মহারাষ্ট্র পুলিশ? জনগণ অপেক্ষা করছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব যেমন প্রণব মুখোপাধ্যায়, দ্বিগ্বিজয় সিং, কপিল সিবাল, পি চিদাম্বরম ও অন্যান্যদের কাছ থেকে এইসব প্রশ্নের উত্তর পেতে। স্বচ্ছতা বিষয়টি দাতব্যের মতোই নিজের গৃহ থেকেই শুরু করা উচিত।

(সৌজন্যে : দি স্টেটসম্যান)

সার্ধশতবর্ষের মূল্যায়ন

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও ভারতীয় চেতনা

ডঃ প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

ঐতিহ্য ও আধুনিকতা সম্পর্কে জনমানসে সঠিক ধারণা দেখা যায় না। বুদ্ধিজীবী মহলেও এ বিষয়ে বিভ্রান্তি লক্ষ্য করছি। একটি দেশ ও জাতি তার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কি সঠিক বিকাশের পথে যেতে পারে! সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিষবাষ্পে এখন ভারতের নাজেহাল অবস্থা। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী দম্ভ ভরে বলেছিলেন স্বাধীন ভারত অরাজকতার পঙ্কে নিমজ্জিত হবে। কেননা খড়ের মানুষের (men of straw) হাতে দেশের পরিচালনা নিরাপদ নয়। বিজাতীয় মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত জেহাদি সন্ত্রাস ও মাওবাদী সন্ত্রাস ভারতের নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে তুলেছে, অন্যদিকে রাজনীতিবিদ ও আমলাতন্ত্র এখন পৌনঃপুনিক দুর্নীতির জালে আবদ্ধ। এই অবস্থায় দেশের পরিত্রাণ-এর সঠিক দিশা কি? আসলে দু' ধরনের ব্যাধি আমাদের দুর্বল করে রেখেছিল। একটি হলো দেশজ সমাজ ও ধর্মীয় আচার আচরণে অনৈতিকতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের পলি জন্মেছিল। তাই ভারতীয় সভ্যতার প্রবহমানতার গতি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর অন্যদিকে সুদীর্ঘ বিদেশী শাসনে জাতীয় চরিত্র কলুষিত হয়ে ওঠে। আত্মশক্তি ও আত্মপরিচয় থেকে বিচ্যুত হয়ে আত্মকলহ ও দাস্যভাবে নিজেদের নিমগ্ন করে তুলল। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হলো জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ভুলে গিয়ে পাশ্চাত্যকরণকে আধুনিকীকরণের একমাত্র পথ ও পন্থা হিসেবে বেছে নেওয়া হলো। সাংস্কৃতিক ও মানসিক দিক থেকে আত্মবিস্মৃতি একটি জাতির পক্ষে সবচেয়ে ক্ষতিকারক। ১৯৭২ সালে ইউনেস্কো আয়োজিত সেমিনারে আফ্রিকার শীর্ষস্থানীয় বিপ্লবী ও চিন্তাবিদ আমিলকার কাব্রাল (cabral) সুস্পষ্ট ভাষায় শিকড়ে ফেরার (Return to the source) আহ্বান জানিয়েছিলেন। (Return to the source) তাঁর মতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাসত্বের চেয়েও বেশি ক্ষতিকারক হলো সাংস্কৃতিক দাসত্ব। স্বাধীনতার যাট বছর পরে আমরা বুঝতে পারছি কিভাবে রাজনৈতিক দলগুলি দেশীয় সংস্কৃতি অগ্রাহ্য করে ভারতের সহজাত বিকাশের পথ রুদ্ধ করছেন। 'ইন্ডিয়া' বনাম 'ভারত' এর বিভাজন সৃষ্টি করে জাতি নির্মাণের পথকে কন্টাকাকীর্ণ করে তোলা হয়েছে। লোকমান্য তিলক, মহাত্মা গান্ধী, শ্রী অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, লালা লাজপত রায়, বিবেকানন্দ সকলেই ভারত আত্মার অনুসন্ধান করেছেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় চরিত্রের এই গলদকে কমলাকান্তের দপ্তরে 'বাবু' শীর্ষক রচনায় বিধৃত করেছেন।

এইসব বিষয় অবতারণা করে এখন সার্ধ শতবর্ষে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য-এর অবদান আলোচনা করা যেতে পারে। ইতিহাসের গবেষকগণ সচরাচর নরমপন্থী ও সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদীদের প্রগতিবাদী ও পুনরুজ্জীবনবাদী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। এখন প্রশ্ন হল তিলক, লাজপত রায়, শ্রী অরবিন্দ চরমপন্থী নেতা ছিলেন, তাই তাঁরা ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে জাতীয় আন্দোলনের গতি পরিচালিত করেছিলেন। আবার অনেকে হিন্দু মহাসভাকে মুসলিম রাজনীতির বিপরীত হিন্দু মৌলবাদী রাজনীতির প্রতিষ্ঠান বলে চিহ্নিত করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের নতুন পাঠক্রমে এমনটাই করা হয়েছে। প্রশ্ন হলো লালা লাজপত রায় চরমপন্থী নেতা ছিলেন, মদনমোহন মালব্য ছিলেন তথাকথিত নরমপন্থী নেতা। তাহলে দুজনেই কেন ১৯২০-এর দশকে হিন্দু মহাসভার রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছিলেন? এর কারণ খুঁজতে হবে খিলাফত আন্দোলনের মধ্যে। গান্ধীজী নিজের অজান্তে প্যান ইসলামীয় খিলাফত প্রশ্নকে জাতীয় সংগ্রামের স্রোতে সংযুক্ত করেছিলেন। এর পরিণামে কি হয়েছিল? মহম্মদ আলি, শওকত আলির মতো প্রথম সারির খিলাফত নেতারা মুসলিম মৌলবাদী রাজনীতিতে সামিল হন। জাতীয় কংগ্রেসের দোদুল্যমানতা ও ক্লীবতা দেখে সক্রিয় জাতীয়তাবাদীরা হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন। বিপ্লবী সাভারকর। চরমপন্থী লাজপত রায়, তিলক অনুগামী বি এস মুঞ্জে এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় মদনমোহন মালব্য সংকীর্ণ ধর্মাশ্রিত রাজনীতির বিকল্প হিসাবে দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পরিপুষ্ট করতে চেয়েছিলেন।

আজ থেকে ১৫০ বছর আগে মদনমোহন মালব্য ১৮৬১ খৃস্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর এলাহাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা পণ্ডিত ব্রহ্মনাথ মালব্য, মাতা মুন্না দেবী, যোড়শ শতকে তাঁর পূর্বপুরুষ মালব থেকে বর্তমান উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদে আসেন। এইজন্য তাঁদের পারিবারিক পদবি হল মালব্য। ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে মদনমোহন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এনট্রান্স ও ১৮৮৪ সালে এলাহাবাদ থেকে স্নাতক হন। পরে আইন পরীক্ষায় পাশ করে এলাহাবাদ হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। এছাড়া তরুণ বয়সেই তিনি কুশলী সাংবাদিক হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। হিন্দুস্থান, ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন, অভ্যুদয় প্রভৃতি হিন্দি ও ইংরেজী সাময়িক পত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন।

কিন্তু স্বদেশ প্রেমিক মদনমোহন নিছক পেশাদারী জীবনে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। দেশসেবার প্রেরণায় প্রথম থেকেই জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হন। এছাড়া এলাহাবাদ পৌরসভার সহ-সভাপতি ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পরে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য হন। কংগ্রেস রাজনীতিতে তিনি নরমপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সংস্কার সাধন তাঁর কাম্য ছিল। তিনবার জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন— যথা লাহোর (১৯০৯), দিল্লী (১৯১৮) ও ১৯৩২ (দিল্লী) অধিবেশনে। কিন্তু মদনমোহন কোনও সংকীর্ণ

দৃষ্টিভঙ্গি আঁকড়ে ধরে থাকেননি। এই জন্য তিনি যেমন অ্যানি বেসান্ত-এর হোমরুল আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন, অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে স্বাগত জানান। ১৯১৯ খৃস্টাব্দে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হন।

ভারতীয় ঐতিহ্য ও হিন্দুদের অভিভাবকত্ব : পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে সংরক্ষণ নীতির তীব্র বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ১৯০৯ খৃস্টাব্দে মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইনে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক আসন সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ ও ব্যবধান বৃদ্ধি পায়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ অনুসৃত বিভাজন ও শাসন (Divide and Rule) ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পক্ষে অশনি সংকেত হয়ে ওঠে। তাই হিন্দু সমাজের স্বার্থ যাতে বিপন্ন না হয় সেজন্যে হিন্দু সমাজকেও সঙ্ঘবদ্ধ করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। ১৯০৯ সালে লাহোরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে মালব্যজী সভাপতিত্ব করেন। কংগ্রেস অধিবেশনের আগে (অক্টোবর) পাঞ্জাব হিন্দুসভার উদ্যোগে হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে হিন্দু জাতির উন্নয়নে শিক্ষার প্রসারের কথা বলা হয়। অবশ্য ইতিপূর্বে ১৯০৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে মালব্যজী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। ১৯১২ খৃস্টাব্দে লালা লাজপত রায় দিল্লীতে হিন্দু কলেজ স্থাপনে উদ্যোগী হন।

স্মরণে রাখা প্রয়োজন, হিন্দু মহাসভা নিছক সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়নি। হিন্দু সমাজের স্বার্থসংরক্ষণ ও সহজাত বিকাশ সাধন এর লক্ষ্য ছিল। ১৯১৫ খৃস্টাব্দে নিখিল ভারত হিন্দুসভার প্রথম অধিবেশন বসে এলাহাবাদে। বাংলার অগ্রণী জমিদার ও কর্মযোগী মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সভাপতিত্ব করেন। ১৯১৮ সালে তিনি হিন্দু সভার সভাপতির দায়িত্ব নেন। ১৯২৩-২৪ সালে হিন্দুসভা হিন্দু মহাসভা নামে পরিচিত হয় এবং মদনমোহন মালব্য সভাপতি মনোনীত হন। জাতীয় ঐতিহ্য ও জাতীয় চেতনাকে সঞ্জীবিত করার জন্য মালব্যজী প্রকৃত শিক্ষার উপযোগিতা অনুধাবন করেন। ইতিমধ্যে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর মাধ্যমে ভারতের প্রাচীন আশ্রমকেন্দ্রিক শিক্ষাকে নতুন অবয়ব দান করেন। বেনারসে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে মালব্যজী মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অকুণ্ঠ সমর্থন পান। ১৯১৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হয়।

বিভিন্ন রাজা মহারাজা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপন ও পরিচালনার জন্য আর্থিক অনুদান দেন। (সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী— History of the Cossimbazar Raj, দ্বিতীয় খণ্ড পৃ: ২৩২-২৩৪)

১৯২০-র দশকে মালব্যজী ও লালা লাজপত রায় দুজনে রাজনৈতিক দিক থেকে পরস্পরের কাছাকাছি আসেন। খিলাফৎ আন্দোলনের অবসানের পর দাঙ্গা-হাঙ্গামার রাজনীতি শুরু হয়। স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে হত্যা করা হয়। তাই লাজপত রায় ও মদনমোহন মালব্য হিন্দুদের শক্তি সঞ্জীবিত করার জন্য হিন্দু মহাসভায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং নীতি নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা নেন (ফিরোজ চাঁদ—লাজপত রায়, পৃ: ৪৬৫, ৪৯৫)। তাঁরা দুজনেই মুসলিম সম্প্রদায়কে ব্লাঙ্ক চেক দিতে রাজী ছিলেন না। এদিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পর স্বরাজ্য পার্টির শক্তিহানি ঘটে। স্বরাজ্য দলের নেতা মতিলাল নেহরুকে তাঁরা পছন্দ করতেন না।

১৯২৬ সালের নির্বাচনে স্বরাজ্য পার্টির আসন হ্রাস পায় এবং মালব্যজী-লাজপত রায় প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিস্ট পার্টি বিভিন্ন প্রদেশে জয়যুক্ত হয়। উত্তরপ্রদেশে শুধুমাত্র মতিলাল নেহরু জয়লাভ করেন। পুত্র জওহরলাল-কে লিখিত এক পত্রে (২ ডিসেম্বর ১৯২৬) মতিলাল মালব্যজী ও লাজপত রায়-কে অশুভ জোট (Malaviya-Lala Gang) বলে কটূক্তি করেছিলেন। মতিলাল ওই পত্রে লিখেছিলেন যে হিন্দু-বিরোধী ও গো-হত্যার সমর্থক বলে তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হয়েছে। মতিলাল ক্রুদ্ধ হয়ে লিখলেন "The Malaviya-Lala Gang aided by Birla's Money are making Frantic efforts to capture the Congress" (A Bunch of old Letters—জওহরলাল নেহরু, পৃ: ৫১-৫৩), কিন্তু মতিলাল গালমন্দ দিলেও দেশের স্বার্থে সাংবিধানিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে নেহরু কমিটি গঠিত হলে মালব্যজী ও লাজপত রায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

১৯২৮ সালের ১৭ নভেম্বর লালা লাজপত রায়-এর মৃত্যুর ফলে মালব্যজী এক পরম মিত্রকে হারালেন।

১৯৩০ সালের পর জাতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। বৃটিশ সরকার গোলটেবিল বৈঠকে ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানালেন। মালব্যজী হিন্দু সমাজের নেতা হিসাবে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিলেন। কিন্তু বৃটিশ সরকার দু'মুঠো ভেদনীতির কৌশল গ্রহণ করল—একদিকে হিন্দু বনাম মুসলমান, অন্যদিকে হিন্দু সমাজের মধ্যে উচ্চবর্ণ ও তপশীলী জাতির মধ্যে বিভাজন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতির প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন মদনমোহন মালব্য। একদিকে হিন্দু সমাজের বিভাজন ঠেকাবার জন্য বি আর আম্বেদকরের সঙ্গে মিলিতভাবে গান্ধীজীর অনশন ভঙ্গ করতে উদ্যোগী হন, অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচনের জন্য মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তৎপর হলেন। মুসলমান অধ্যুষিত বাংলা ও পাঞ্জাবে রাজনীতির নিয়ন্ত্রক হবার সুযোগ পেল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়। এই অবস্থায় মদনমোহন মালব্যের নেতৃত্বে জাতীয় ঐক্যে আস্থাশীল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নেতারা বোম্বাইয়ে এক সম্মেলন ডাকলেন (১৯৩৪, অক্টোবর)। মালব্যের পাশে দাঁড়ালেন এন সি কেলকার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এম এস অ্যানে প্রমুখ। বাংলার শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ নীলরতন সরকার এই বিষয়ে সমর্থন জানান। জাতীয় কংগ্রেসের 'না গ্রহণ না বর্জন' নীতি পরোক্ষভাবে মুসলমান তোষণ নীতির সমার্থক ছিল।

মৃত্যুর পূর্বে (১২ নভেম্বর ১৯৪৬) মদনমোহন মালব্যের দূরদর্শিতা প্রমাণিত হলো। মুসলিম লীগ হিন্দুঘাতী দাঙ্গা হাঙ্গামার পথে অগ্রসর হয়। ভারতীয় রাজনীতিতে তমসাচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টি হলো। এরই পরিণতি ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাগ। মালব্যজীর সৌভাগ্য, তিনি দেশবিভাগের বেদনাদায়ক ঘটনাক্রম দেখে যাননি।

প্রকৃত মহাত্মার প্রতীক : সার্ধ শতবর্ষে মালব্যজীর আদর্শ ও জীবনের দিকে চোখ ফেরালে দেখা যাবে যে মালব্যজী সঠিক দিশা দেখিয়েছেন। রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার, কপটতা, দলতন্ত্র ও সন্ত্রাসবাদী আঘাতে দেশ ও জাতীয় জীবন বিপন্ন প্রায়। সততা ও নৈতিক মূল্যবোধের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ছিলেন মালব্যজী। কথায় ও কাজে এই বরেণ্য দেশপ্রেমিক ছিলেন প্রকৃত মহাত্মা। শাসক জাতীয় কংগ্রেস পরিবারতন্ত্র ও দুর্নীতির চোরাবালিতে আবদ্ধ। বিজাতীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী কমিউনিস্টরা দুষ্ট ক্ষত সৃষ্টি করেছে। কাশ্মীর প্রশ্নে তারা চোরাগোপ্তা খেলা খেলছে। বিদেশী পুঁজিবাদী আগ্রাসনে দেশীয় অর্থনীতি একেবারে বেসামাল। তাই সদর্থক ও সক্রিয় জাতীয়তাবাদ আজ একান্ত প্রয়োজন।

পশ্চিমবাংলায় কেন্দ্রীয় কংগ্রেস মন্ত্রী ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ ধারণ করে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃথক ক্যাম্পাস খুলছেন। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল ভবন উদ্বোধন হয়েছে। তাঁরা কি মালব্যজী প্রতিষ্ঠিত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস এই রাজ্যে খুলতে রাজী আছেন? বোধ করি নয়। কেননা ভারত ও হিন্দু শব্দ দুটি তাঁদের কাছে অস্বস্তিকর।

হিন্দুদের জন্য ভাবনা, সাম্প্রদায়িকতা ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

চিত্তব্রত পালিত

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ১৮৬১ সালের ২৫ ডিসেম্বর এক চতুর্বেদী ব্রাহ্মণ পরিবারে এলাহাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। এই পরিবার আর্থিক দিক থেকে দুঃস্থ হলেও এঁদের সামাজিক মর্যাদা এবং সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্যের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর পিতামহ পণ্ডিত প্রেমধর এবং পিতা ব্রজনাথ ধর উভয়েই সংস্কৃতে পারদর্শী ছিলেন। এঁরা ছিলেন পরম বৈষ্ণব রাধাকৃষ্ণের পূজারী এবং গভীর ধর্মভাব সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। রেওয়ার মহারাজা, দ্বারভাঙার মহারাজা এবং বেনারসের মহারাজা ব্রজনাথকে গুরু বলে মানতেন। রামায়ণ এবং মহাভারতের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল।

মদনমোহনেরা পাঁচ ভাই এবং দুই বোন। তিনি শৈশব থেকে সংস্কৃত শ্লোক বলতে পারতেন। পাঁচ বছর বয়সে তাঁকে পণ্ডিত হরদেবের ধর্ম জ্ঞানোপদেশ পাঠশালায় ভর্তি করে দেওয়া হয়। এখানে সরল শিক্ষার পরিবর্তে গীতিধর্মের উপদেশ দেওয়া হোত। তিনি তাই পাঠশালা ছেড়ে ১৮৬৯ সালে জেলা স্কুলে ভর্তি হন। এর কারণ তিনি ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু এই স্কুলের মাইনে জোগানো ব্রজনাথের পক্ষে দুষ্কর ছিল। তখন তাঁর মা গহনা বিক্রি করে পুত্রের পড়াশুনার খরচ চালিয়ে যান। এইভাবে ১৮৭৯ সালে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করে মুইর সেন্ট্রাল কলেজে ভর্তি হলেন। এখানে তিনি সংস্কৃতের অধ্যাপক পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্যের দ্বারা প্রভাবিত হন। নানারকম সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে তিনি ঠিক সময়ে পরীক্ষা দিতে পারেননি। ১৮৮৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন। এরপরে ১৮৭৮ সালে মীর্জাপুরের শিক্ষক পণ্ডিত নন্দরামের কন্যা কুন্দনদেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এই বিবাহ সূত্রে তাঁর তিনটি কন্যা এবং চারটি পুত্রের জন্ম হয়। ১৯৪২ সালে কুন্দন দেবীর মৃত্যু হয়। দারিদ্রের কারণে মালব্য এম.এ. পড়তে পারেননি। তিনি নিজের ইস্কুলেই ৪০ টাকা মাসিক বেতনে শিক্ষক নিযুক্ত হন। যদিও তিনি খুবই জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন।

তাঁর কাছে রাজনৈতিক জীবন অনেক বেশি কাম্য ছিল। ১৮৮৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে কলকাতায় তিনি তাঁর সংস্কৃতের অধ্যাপক পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্যের সঙ্গে যোগদান করেন। সেখানে তাঁর বক্তৃতা ক্ষমতা সবাইকে মুগ্ধ করে। অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম কংগ্রেসের সম্পাদক হিসেবে বাৎসরিক প্রতিবেদনে তাঁর সপ্রশংস উল্লেখ করেন। কলকাতা থেকে এলাহাবাদে ফিরেই তিনি হিন্দুস্থান হিন্দী সাপ্তাহিকের সম্পাদক নিযুক্ত হন। মাসিক বেতন ২০০ টাকা। ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত মালব্য এই কাজ করেন। এরপরে তিনি আইনজীবীর বৃত্তি গ্রহণ করেন। এছাড়া আদিত্যরাম প্রবর্তিত ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন সাপ্তাহিকীর সম্পাদক হিসেবেও তিনি কাজ করেন। কিন্তু মালব্য এতেই ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি একজন রাজনৈতিক নেতা হবার বাসনা পোষণ করতেন। ১৮৯১ সালে তিনি এল. এল. বি. পাশ করেন। ১৮৮৬ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত তিনি নিয়মিত কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতেন। এরই মধ্যে ১৮৮৭ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন এলাহাবাদে আহূত হয় এবং মালব্য অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। ১৮৯২ সালে আবারও তিনি কংগ্রেসের অধিবেশন এলাহাবাদে ডাকেন। সেখানে তিনি দেশের পরাধীনতা বৃটিশ অর্থনৈতিক নীতির ফলে জনতার দারিদ্র্য এবং সর্বকর্মে বৃটিশ অফিসারদের প্রাধান্য প্রভৃতি বিষয়ে জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। কংগ্রেস কর্মী হিসেবে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে চারবার কংগ্রেসের সভাপতি করা হয়। ১৮৯০ এবং ১৯১৮-তে তিনি সভাপতিত্ব করলেও ১৯৩২-৩৩-এ অধিবেশন সরকারি নির্দেশে স্থগিত রাখার কারণে সভাপতির দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। পট্টভি সীতারামাইয়া তাঁর কংগ্রেসের ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে ১৯৩০-এর দশকে কংগ্রেসের দুর্দিনে কংগ্রেস একান্তই তাঁর মুখাপেক্ষী ছিল।

কংগ্রেসের সমর্থক হলেও তিনি ১৯০৬ সালে হিন্দু মহাসভা প্রতিষ্ঠা করেন। এটা মুসলিম বিরোধিতার জন্য সৃষ্ট হয়নি। বৃটিশের বিভেদের নীতির বিরোধিতা করাই ছিল সভার উদ্দেশ্য। ১৮৯৩ সালে মালব্য হাইকোর্টের উকিল হিসেবে স্বীকৃতি পান। চারদিক থেকে তাঁর কাছে মক্কেলরা আসতে থাকে। কিন্তু তিনি অর্থের লালসায় আইন ব্যবসায় আসেননি। দেশের কাজই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। ১৯০৯-এ তিনি এই পেশা ছেড়েই দেন বলা যেতে পারে। কিন্তু ১৯২২-এ তিনি আবার কালো পোষাক পরেন। চৌরিচৌরা ঘটনায় ধৃত ২২৫ জন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত রাজনৈতিক অপরাধীর মুক্তির জন্য তিনি সওয়াল করেন। এতে ১৫৩ জন বন্দী খালাস পান। এইসময় মালব্য জনশিক্ষার উদ্দেশ্যে হিন্দী পত্রিকার প্রচার ও প্রসার প্রয়োজন বলে অনুভব করেন। তিনি একে একে

“ দলিত শ্রেণির প্রতি তাঁর বিশেষ মমতা ছিল। অস্পৃশ্যদের মন্দিরে প্রবেশ সংক্রান্ত আন্দোলনে তিনি সামিল হন। এদের মধ্যে ধর্মান্তরিতদের তিনি শুদ্ধিকরণের ব্যবস্থা করেন। শ্রীরাম জয় জয় রাম মন্ত্র পড়ে গঙ্গায় ডুব দিলে শুদ্ধি হোত। নিজে আচারনিষ্ঠ সদ্ ব্রাহ্মণ হলেও জাত-পাতের কারণে মহিলাদের হীনাবস্থার তিনি প্রবল প্রতিবাদ করেন। ”

১৯০৭ সালে অভ্যুদয়, মালিক মর্যাদা, কিষাণ এবং ইংরেজিতে ‘লিডার’ পত্রিকার প্রচলন করেন। এই সমস্ত পত্রিকার খরচ তিনিই চালাতেন। এর মধ্যে অভ্যুদয় এবং লিডার মুক্তির সন্ধানে দীর্ঘ ৫০ বছর হিন্দুস্তান টাইমস্ পত্রিকার পরিচালক সমিতির অধিকর্তা থাকেন।

১৯০২ সালে তিনি প্রাদেশিক বিধানসভার সভ্য হন। এর পিঠোপিঠি ১৯০৯ সালে তিনি রাষ্ট্রীয় সংসদেরও সদস্য হন। ১৯১৭-র মধ্যে তিনি বিদেশে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিক নিয়োগ বন্ধের প্রতিবাদ করেন। রেলকে জাতীয়করণের প্রস্তাব আনেন। প্রেস আইন এবং দেশদ্রোহী আইনেরও বিরোধিতা করেন। ১৯১২ সালেই তিনি প্রথম গ্রাম পঞ্চায়েত স্থাপনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন এবং বয়েস স্কাউট আন্দোলনের পুরোধা হন। ১৯১৬ সালে তাঁকে ভারতীয় শিল্প কমিশনের সদস্য করা হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শেখার জন্য ভারতীয়দের স্বার্থে একটি রাষ্ট্রীয় পলিটেকনিকের প্রস্তাব আনেন। তিনি সর্বপ্রকার দমননীতির তীব্র সমালোচনা করতে থাকেন। ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলে তিনি সংসদের সভ্যপদে ইস্তফা দেন। পরে তিনি ১৯২৪ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত আবারও সদস্যপদে বৃত হন। কিন্তু লবণ সত্যাগ্রহের সময় আবার এতে ইস্তফা দেন এবং ওই আন্দোলন যোগদান করেন।

১৯৩১-এ তাঁকে গোলটেবিল বৈঠকে ডাকা হয় কিন্তু বৃটিশ মনোভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে দেশে ফেরেন। এই সময় তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এইটিই তাঁর জীবনের অক্ষয় কীর্তি। তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষার দীপ্তিকে আলোকিত ও উদ্দীপিত করতে সচেষ্ট হন। হিন্দু সংস্কৃতির উপর তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পিছনে তাঁর ওই সংস্কৃতি চেতনাই কাজ করেছিল। কিন্তু শুধু হিন্দু সংস্কৃতির চর্চা বাড়ানোই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, এখানে তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারও ঘটিয়েছিলেন। আজও সেখানে কৃষি, প্রযুক্তি, ধাতু বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ বিষয়ক বিভাগ বর্তমান। প্রথম উপাচার্য পণ্ডিত সুন্দরলালের স্মৃতিতে একটি অ্যালোপ্যাথিক হাসপাতালও তিনি স্থাপন করেন। ১৯১৫ সালের ১ অক্টোবর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় আইন বলে প্রতিষ্ঠা হয় এবং ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯২১ সালে বৃটিশ যুবরাজ এর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। এর সমুদয় অর্থ (৩৫ লক্ষ) তিনিই সংগ্রহ করেন। মালব্য ১৯১৯ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত উপাচার্য থাকেন এবং তার পরেও আমৃত্যু তিনি রেক্টর পদে বৃত ছিলেন।

উনিশ শতকের শেষাশেষি ভারতে এক হিন্দী জাগরণের সূচনা হয়। ভারতেন্দু হরিশচন্দ্র, রাজা শিবপ্রসাদ এবং বালমুকুন্দ গুপ্ত প্রমুখের লেখনীর প্রভাবে এক হিন্দু পুনরুজ্জীবনও সংঘটিত হয়। মালব্য নিজেও হিন্দীতে কবিতা এবং প্রবন্ধ রচনা করে সুখ্যাত হন। জনমানসে এই সংস্কৃতি প্রচার করতে গেলে হিন্দী ভাষার পুনরুজ্জীবন একান্তই অভিপ্রেত ছিল। মালব্য দেব নগরী লিপিতে সমস্ত হিন্দী রচনা মুদ্রিত করেন। এইভাবে আরবী-ফরাসী-র প্রভাব কমে যায় এবং হিন্দী উর্দুর স্থান গ্রহণ করে।

সামাজিক চিন্তা-চেতনায় তিনি একটু গোঁড়া ছিলেন। যেমন, বর্ণাশ্রম প্রথাকে প্রথমে তিনি সমর্থন করেন। পরে অবশ্য তিনি তাঁর মত বদলান। দলিত শ্রেণির প্রতি তাঁর বিশেষ মমতা ছিল। অস্পৃশ্যদের মন্দিরে প্রবেশ সংক্রান্ত আন্দোলনে তিনি সামিল হন। এদের মধ্যে ধর্মান্তরিতদের তিনি শুদ্ধিকরণের ব্যবস্থা করেন। শ্রীরাম জয় জয় রাম মন্ত্র পড়ে গঙ্গায় ডুব দিলে শুদ্ধি হোত। নিজে আচারনিষ্ঠ সদ্ ব্রাহ্মণ হলেও জাত-পাতের কারণে মহিলাদের হীনাবস্থার তিনি প্রবল প্রতিবাদ করেন। ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক বিবাহের তিনি সমর্থক ছিলেন। শৈশব থেকেই তিনি পারিবারিক পরিবেশে হিন্দু ধর্মের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। পবিত্রতা, সত্য, সংযম এবং মঙ্গলচিন্তা তাঁকে ঘিরে রেখেছিল। এইদিক থেকে তিনি মহাত্মা গান্ধীর সমতুল্য। ভারতীয় জনসাধারণের কাছে তিনি পরমপূজ্য ছিলেন। ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতি, স্বদেশী শিল্প, শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ কল্যাণ এবং হিন্দীর প্রসার তাঁর অভীষ্ট ছিল। জাতীয়তাবোধই তাঁকে এ সব ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৯১৪-৪৬ পর্যন্ত তিনি ভারতীয় সেবা সমিতির সভাপতি হিসেবে কাজ করেন। সি. এফ. অ্যান্ড্রুজ তাঁকে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি নেতা হিসেবে সর্বসাধারণের কাছে খুব জনপ্রিয় ছিলেন। দরিদ্র হিন্দু বা মুসলমান ছাত্র তাঁকে শিক্ষার জন্য আবেদন করলে তিনি সব রকম ব্যবস্থাদি করে দিতেন। একবার এক মুসলমান ছাত্র ছাত্রাবাসের রন্ধনশালার অব্যবস্থার ব্যাপারে অভিযোগ করলে তিনি খুবই ব্যথিত হন এবং নিজের পাকশালায় তিনি তাকে আহ্বান করেন। তাঁর চির পরিচিত শুভ্র বস্ত্র তাঁকে নিষ্কলুষ পণ্ডিত হিসেবে পরিচিতি দিয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা থাকলেও অসহযোগের কারণে স্কুল-কলেজ বন্ধ করার তিনি বিরোধী ছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনকেও পুরোপুরি সমর্থন করতে পারেননি।

পরবর্তীকালে কংগ্রেসী এবং মার্কসবাদী নেতারা সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে হিন্দুত্ববাদী হিসেবে চিহ্নিত করলেও একজন জাতীয়তাবাদী হিসেবে তিনি সবরকম সংকীর্ণতার উর্ধ্বে ছিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর জন্য কিছু করাকে তিনি সংকীর্ণতা এবং সাম্প্রদায়িকতা বলে মনে করতেন না। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, “তোমার উদাত্ত আহ্বান দেশকে উদ্বুদ্ধ ও একতাবদ্ধ করেছে। তুমি তাদের হৃদয় স্পর্শ করেছ এবং কর্মে উদ্যোগী করেছ।”

অন্য রকম

ছ ফুট ছ ইঞ্চি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ছ ফুট ছ ইঞ্চির মানেটা বোধগম্য হলো তো? ঠিক ধরেছেন। উচ্চতার কথাই বলছি। তবে কিনা মানুষের উচ্চতা। আজ্ঞে হ্যাঁ, এরকম লম্বা মানুষ বড় একটা দেখা যায় না। এই রে, আবার একটা গ্র্যামাটিক্যালি মানে ব্যাকরণগত ভুল হয়ে গেল। এই উচ্চতাটা কোনও মানুষের নয়, এক মানুষী-র (মানুষের স্ত্রী-লিঙ্গ, শুদ্ধ ভাষায় মানবী বলা যেতে পারে)। চমকে উঠলেন না কি? কোনও মহিলা'র উচ্চতা ছ ফুট ছ ইঞ্চি! নিশ্চয়ই ভাবছেন কোথাকার মহিলা রে বাবা? ম্যাডাগাস্কার নাকি হনোলুলু? কিংবা পৃথিবীর বাইরে নেপচুন-প্লুটো টাইপের গ্রহের কোনও মেয়ে হবে হয়তো। বিলকুল ভুল ভাবছেন। ছ ফুট ছ ইঞ্চির বালিকা (ঠিকই পড়ছেন—বালিকাই হবে, বয়স মাত্র বছর পনেরো) পুনম চতুর্বেদী খোদ ভারতীয়। পুনম কিন্তু একজন খেলোয়াড়। ফাস্ট বোলার টাস্ট বোলার ভেবে বসবেন না। পুনম ক্রিকেটার নন বাস্কেটবলার। যাঁর এমন 'হাইট' তিনি যে বাস্কেটবলে বাজিমাত করে ছাড়বেনই, এতে আর নতুন কথা কি! ঠিক হয়েছেও তাই। গত ২ জুন নাগপুরে অনূর্ধ্ব ১৬ জাতীয় যুব বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পুনম ছত্তিশগড়ের হয়ে ৯ পয়েন্টে হারিয়ে দিল কেরলকে। ছত্তিশগড়ের কোচ রাজেশ প্যাটেল খেলার পর সাংবাদিকদের জানিয়েছেন— ভারতের সবচেয়ে উচ্চতা-সম্পন্ন মহিলা বাস্কেটবলারটি নিজেকে সাফল্যের এই ক্ষুদ্র গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ রাখতে চান না। তাঁর লক্ষ্য দৈহিক উচ্চতা'র পাশাপাশি খেলোয়াড়ি দক্ষতার উচ্চতাকেও এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যাতে কেউ তার নাগাল না পায়। আর সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছে পুনম।

রাজেশের এমন ঘোষণাকে স্বাগত না জানিয়ে উপায় আছে? সত্যি কথা বলতে কি গীতু অ্যান জোশ-কে বাদ দিলে ভারতে আর সেরকম মহিলা বাস্কেটবলার কোথায়? বিশেষ করে 'হাইট'টাই বরাবর প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতীয় মহিলাদের ক্ষেত্রে; তা সে বাস্কেটবলই হোক, ক্রিকেটই হোক কিংবা মাউন্টেনিং। পুনমের সম্ভাবনা সেই অর্থে স্রেফ খেলাধুলোতেই আশার আলো জাগাচ্ছে না, খর্বাকৃতি'র অপবাদ থেকে ভারতীয় রমণীদেরও রেহাই দিচ্ছে। তবে পুনমের এহেন উচ্চতায় তাঁর পারিবারিক ক্ষেত্রে একটা সমস্যারও সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন উত্তরপ্রদেশের পুলিশ কনস্টেবল ও পুনমের বাবা শ্রীরাম চতুর্বেদী'কে আর যাই হোক বেঁটে বলা তো চলেই না; বরং গড়পড়তা ভারতীয় পুরুষদের চেয়ে তাঁকে লম্বা বলাই সমীচীন। অথচ কন্যা পুনমের পাশে শ্রীরাম এতটাই ছোটোখাটো যে পুনমের কাঁধের উচ্চতা অতিক্রম করতেও তিনি অপারগ। শ্রীরামের চার পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠতমটিই লম্বায় সবচেয়ে বড় এবং তার উচ্চতাও পুনমের উচ্চতার ইঞ্চি চারেক আগে থেমে গিয়েছে!

যাই হোক, অষ্টম শ্রেণী থেকেই পুনমের ক্রীড়া-প্রতিভা সবার গোচরে আসে। সঙ্গে 'হাইট'টাও। অনূর্ধ্ব ১৬ জাতীয় যুব চ্যাম্পিয়ানশিপই তাঁর প্রথম টুর্নামেন্ট আর তাতেই সাফল্য। ১৫ বছর বয়সেই যাঁর উচ্চতা ছ ফুট, ছ ইঞ্চি তিনি যে আরও কত লম্বা হবেন কে জানে! তাঁর খেলাও তাঁর উচ্চতার মতোই বেড়ে উঠুক। প্রার্থনা থাক এটুকুই।

সমীক্ষায় উঠে এল বিস্ফোরক তথ্য

ভারতে এনজিও-গুলোর হাতে ব্যাপক বিদেশী অর্থ

বিশেষ প্রতিনিধি ॥ কবেই জগৎগুরু আদি শংকরাচার্য বলে গিয়েছেন—"অর্থম্ অনর্থং ভাবয় নিত্যং" অর্থাৎ অর্থই অনর্থের মূল। বর্তমান ভারতবর্ষে এখন সেটাই প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে।

বিদেশ থেকে বিভিন্ন দেশ ভারতে সক্রিয় বিবিধ বেসরকারি সংস্থার নামে বিশাল অঙ্কের টাকা পাঠাচ্ছে নানান অছিলায়। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সেখানে দেখা উচিৎ ওই সব এন জি ও-গুলো এদেশে কি উদ্দেশ্যে, কেন কাজ করছে। বিভিন্ন পাশচাত্য দেশ কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাদেরকে হাজার হাজার কোটি টাকা দিচ্ছে। এটা ঠিকমতো নজরদারি করা হচ্ছে না বলেই ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি রাজ্যে এরকম বৈদেশিক অর্থের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। শীর্ষে রয়েছে তামিলনাড়ু। ক্রমাগত বেড়ে চলেছে এন জি ও-দের সংখ্যা এবং অর্থের স্রোতও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে।

১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে ভারতের ১৫,০৩৯টি পঞ্জীকৃত এন জি ও পেয়েছিল ১৮৬৫ কোটি টাকা। ২০০৮-০৯ পর্যন্ত সর্বমোট ৩৬,৪১৪টি এন জি ও-এর মোট অর্থ প্রাপ্তির পরিমাণ ৮৪,১৮২ কোটি টাকা। ওই সব টাকা দিয়ে কি কাজ করা হয়েছে, কোন্ কাজে সদ্ব্যবহার হয়েছে তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সঞ্জীব নায়ার। এজন্য তিনি কেন্দ্র সরকারকে সাবধান করে দিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রী নায়ার লিখেছেন—১৯৭৬ সালে ফরেন কনট্রিবিউশন রেগুলেশন অ্যাক্ট (সংক্ষেপে এফ সি আর এ) পাশ হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য হলো নন গভর্ণমেন্টাল অরগ্যানাইজেশন বা এন জি ও-দের হাতে আসা অর্থ সম্বন্ধে খোঁজ-খবর রাখা এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত করা। এই বিষয়টি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীন। কোনও সংস্থা যদি বিদেশ থেকে অর্থ পায় তাহলে অনুমোদনের জন্য তাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে আবেদন করতে হবে। এন জি ও-দের প্রাপ্ত অর্থ একটি নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কে জমা পড়বে এবং প্রতি বছর তাদের সংস্থার অডিট রিপোর্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে পাঠাতে হবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক অতঃপর অডিট রিপোর্ট পরীক্ষা করে দেখবেন যে উদ্দেশ্য অর্থ পাওয়া গেছে সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে কিনা। এরপর সমস্ত সংগঠনের অডিট রিপোর্ট পরীক্ষা করে সেগুলি এফ সি আর-এর বার্ষিক রিপোর্টে প্রকাশিত হবে। মন্ত্রকের নিজস্ব ওয়েবসাইটেও এই তথ্য দেখা যাবে।

সারণী—১

বছর	এন জি ও-র সংখ্যা	হিসেব পাওয়া গিয়েছে	প্রাপ্ত অর্থ কোটি টাকায়
১৯৯৩-৯৪	১৫,০৩৯	পাওয়া যায়নি	১,৮৬৫
২০০৩-০৪	২৮,৩৫১	৬১ শতাংশ	৫,১০৫
২০০৪-০৫	৩০,৩২১	৬১ শতাংশ	৬,২৫৭
২০০৬-০৭	৩৩,৯৩৭	৫৮ শতাংশ	৭,৮৭৮
২০০৭-০৮	৩৪,৮০৩	৫৪ শতাংশ	৯,৬৬৩
২০০৮-০৯	৩৬,৪১৪	৫৫ শতাংশ	১০,৮০৩
			৮৪,১৮২

৩১.৩.২০০৯ সাল পর্যন্ত এফ সি আর-এর অধীনে ৩৬,৪১৪টি রেজিস্টার্ড সংস্থা ছিল। এই সংস্থাগুলি ধর্মীয়, সামাজিক, শিক্ষা, সংস্কৃতিপ্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করে।

এফ সি আর-এর মাধ্যমে আমরা কেন অর্থপ্রাপ্তি বিষয়ে সমীক্ষা করি? কারণ (১) বিপুল অর্থপ্রাপ্তি। ২০০৮-০৯ সালে ২.৪ বিলিয়ন ডলার, ২০০৭-০৮ সালে ২.১৫ বিলিয়ন ডলার এবং ২০০৬-০৭ সালে ২.৪৫ বিলিয়ন ডলার। (২) ১৯৯৩-৯৪ থেকে ২০০৮-০৯ সাল পর্যন্ত অর্থাগমের পরিমাণ ছিল ৮৪.১৮২ কোটি টাকা অর্থাৎ ৮৪১.৮২ বিলিয়ন।

১৯৯৩ সালকে যদি ভিত্তি বছর ধরা হয় তাহলে ২০০০-০১ সাল অর্থাগমের পরিমাণ ছিল ৪১ শতাংশ, ২০০৫-০৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হলো ১০১ শতাংশ আর ২০০৮-০৯ সালে হলো ১৪২ শতাংশ!

২০০৮-০৯ সালে ২০,০৮৮টি সংস্থার মধ্যে ৭,৬৭৯টি কোনও বৈদেশিক অর্থ পায়নি। অর্থাৎ ৪৩ শতাংশ সংস্থা অর্থ সাহায্য পেয়েছে। হিসাব করে আরও দেখা যাচ্ছে আগের বছরের তুলনায় ২০০৮-০৯ সালে ১,১৪০ কোটি টাকা (১১.৪০ বিলিয়ন টাকা) বা ১২ শতাংশ বেশি বৈদেশিক অনুদান পাওয়া গেছে।

এবার দেখা যাক কোনও দেশ থেকে অর্থ সাহায্য আসছে। সবচেয়ে বড় অর্থদাতা দেশ হলো আমেরিকা— ৩.৪৩৩ কোটি (৩৪.০৩ বিলিয়ন) টাকা। তারপর বৃটেন ১.১৩১ কোটি (১১.৩১ বিলিয়ন) টাকা। জার্মানি ১,১০৩ কোটি (১১.০৩ বিলিয়ন) টাকা, ইটালি ৫৪৭ কোটি (৫.৪৭ বিলিয়ন) টাকা, নেদারল্যান্ডস ৫১৩ কোটি (৫.১৩ বিলিয়ন) টাকা এবং জাপান ৪৩৭ কোটি (৪.৩৭ বিলিয়ন) টাকা। দেখা যাচ্ছে আমেরিকা হলো সবচেয়ে বড় দাতা রাষ্ট্র। তারপর স্থান জার্মানি এবং বৃটেনের। বহুবছর ধরে দাতারাষ্ট্রদের মধ্যে আমেরিকার স্থান শীর্ষে।

আমেরিকা ও বৃটেনে অনেকদিন ধরে আর্থিক টালমাটাল চলছে। তা সত্ত্বেও এই দেশগুলি থেকে উত্তরোত্তর অর্থ সাহায্যের পরিমাণ বাড়ছে কেন? দাতা রাষ্ট্রগুলি তো আগে অন্য দেশকে অর্থসাহায্য করার আগে নিজের দেশের প্রয়োজনের কথা ভাববে। পাঠকরা নিশ্চয়ই জানেন যে চার্চকে জার্মানরা আয়ের একটা অংশ কর হিসাবে দেয়। তাহলে কি কর ও ভারতে অর্থ আগমের মধ্যে সম্পর্ক আছে?

২০০৮-০৯ সালে যে দেশগুলি থেকে আগের বছরের তুলনায় বেশি অর্থ সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল সেগুলি হলো : আমেরিকা ১৭ শতাংশ, জার্মানি ১৪ শতাংশ, নেদারল্যাণ্ডস ২৪ শতাংশ,

বেলজিয়াম ২৪ শতাংশ এবং সংযুক্ত আরব আমীরশাহী ছাড়া সব দেশগুলি পশ্চিমের—অর্থাৎ খৃস্টান দেশের।

সংবাদ মাধ্যম থেকে জানা যায় মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলি, যেমন সৌদী আরব ভারতে প্রচুর পরিমাণ টাকা পাঠিয়েছে। (দ্র: http.www.South Asia analysis.org.80/Papers 38/Paper 3715.html)

১৬টি শীর্ষস্থানীয় দাতাদের অর্থ সাহায্যের পরিমাণ ৬৫ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৪,৩৯৪ কোটি (৪৩.৯৪ বিলিয়ন) টাকা।

সবচেয়ে বড় অর্থদাতা সংস্থা হলো : ওয়ার্ল্ড ভিসন ইউ এস এ— ৭০৬ কোটি (৭.০৬ বিলিয়ন) টাকা; গসপেল ফর এশিয়া ইনস্ ইউ এস এ ৫৯৬ কোটি (৫.৯৬ বিলিয়ন) টাকা; ফাউন্ডেশন ভিসেন্টে, বারসিলোনা, স্পেন— ৪৫৯ কোটি (৪.৫৯ বিলিয়ন) টাকা, শ্যাম শ্যাম ধাম সমিতি, ইন্ডিয়া—৩৫৯ কোটি (৩.৫৯ বিলিয়ন) টাকা। অ্যাকশন এড ইন্টারন্যাশনাল—২২৮ কোটি (২.২৮ বিলিয়ন) টাকা এবং ফাউন্ডেশন ভিসেন্টে ফেরের, স্পেন—২৪১ কোটি (২.৪১ কোটি) টাকা।

প্রদত্ত কয়েকটি সারণীর পরিসংখ্যানগুলি লক্ষ্য করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

সারণী—২

অর্থদাতা দেশসমূহ—কোটি টাকায় প্রদত্ত (বাৎসরিক)

বছর	আমেরিকা	জার্মানী	ইউ কে	ইতালি
২০০২-০৩	১৬৮০	৭১৫	৬৮৫	পাওয়া যায়নি
২০০৩-০৪	১৫৮৪	৭৫৭	৬৭৬	৩৫০
২০০৪-০৫	১৯২৭	৯৩১	৭৬৪	৩৫৩
২০০৫-০৬	২৪২৬	১১৮১	১০৬২	৫০০
২০০৬-০৭	২৯৪৯	১০৩৩	১৪২৮	৬০৬
২০০৭-০৮	২৯২৮	৯৭১	১২৬৯	৫১৫
২০০৮-০৯	৩৪৩৩	১১০৩	১১৩১	৫৪৭০
সর্বমোট	১৬,৯২৭	৬,৬৯১	৭,০১৫	২,৮৭১

এই উপরোক্ত বৃদ্ধি ২০০৭—০৯ সালের মধ্যে, পরের অঙ্ক এখনও পাওয়া যায়নি।

সারণী—৩

বিপুল পরিমাণ বিদেশী অর্থ প্রাপক ভারতীয় সংস্থাসমূহ

সংস্থা	২০০৭-০৮ অর্থবৎসর কোটিতে	২০০৮-০৯ অর্থবৎসর কোটিতে
ওয়ার্ল্ড ভিশন অফ্ ইন্ডিয়া, তামিলনাড়ু	২১২	১৯২
রুরাল ডেভেলপ্‌মেন্ট ট্রাস্ট	১২৫	১৫৫
বিলিভার্স চার্চ ইন্ডিয়া, কেরল	১০২	১০০
অ্যাকশন এড, কর্ণাটক	৯২	৭৭
শ্যাম শ্যাম ধাম, দিল্লী	৯০	১০৯
গসপেল ফর এশিয়া, কেরল	৯০	—
ওম্যান ডেভলপমেন্ট ট্রাস্ট, অন্ধ্রপ্রদেশ	৮০	৮২
প্ল্যান ইন্টারন্যাশন্যাল কর্পোরেশন, দিল্লী	৭৪	৬৬
চার্চ অক্সিলারি ফর সোস্যাল অ্যাকশন, দিল্লী	৭০	৬১
শ্রীগজানন মহারাজ সংস্থান, মহারাষ্ট্র	৭০	—
শ্রীশ্রী জগৎগুরু শংকরাচার্য, কর্ণাটক	—	৬০
অক্সফাম ইন্ডিয়া ট্রাস্ট, দিল্লী	—	৬৭
মাতা অমৃতানন্দময়ী মঠ, কেরল	১০২	১১৬
করুণা বালকবিকাশ, তামিলনাড়ু	৯৩	৭৪

বিভিন্ন নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, সিংহভাগ অর্থ প্রাপক এবং দাতা সংস্থাই খৃস্টান মতাবলম্বী। সুতরাং প্রদত্ত অর্থ যে ভারতের গরীব জনসাধারণকে খৃস্ট মতে মতান্তরিত করার জন্য ব্যয়িত হচ্ছে এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

অন্ধ্রের গরীব গ্রামবাসীদের ওপর চলছে বেপরোয়া ওষুধ পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সমস্ত ওষুধ উৎপাদক সংস্থা নিজের তৈরি দ্রব্যের ক্ষমতা যাচাই করার জন্যে গিনিপিগ খোঁজে। সাধারণ ওষুধের ক্ষেত্রে কাজটা খুব সহজে হতে পারে। কিন্তু যে ওষুধের সঙ্গে জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িয়ে থাকে তার প্রয়োগ-পরীক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা প্রয়োজন। এটা অনেক সময়েই পুরোপুরি ঝুঁকির হয়ে ওঠে। এক অসুখ নিরাময়ের কথা ভেবে নতুন ওষুধ পরীক্ষার ফল একরকম মেলে না। কেউ কেউ সহ্য করতে পারেন না। নানারকম শারীরিক প্রতিক্রিয়া ঘটে। কারও কারও ক্ষেত্রে স্থায়ী সমস্যা হয়ে ওঠে। একেবারে হিতে বিপরীত ব্যাপার। আবার কারও কারও শরীরে প্রাথমিক পর্যায়ে সামান্য সমস্যা দেখা দিলেও পরে ভালো সাড়া মেলে। পরীক্ষার জন্য সেজন্যে অনেককে বেছে নিতে হয়। যখন দেখা যায় কোনও ওষুধ প্রয়োগে বেশিরভাগ রোগীর উপকার মিলছে তখন সেই ওষুধ ব্যাপকভাবে উৎপাদন ও বিপণনের দিকে নজর দেয় ব্যবসায়িক সংস্থা। প্রায় সব ওষুধের ক্ষেত্রেই এটা ঘটে। পেনিসিলিন আবিষ্কার করে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা বৈপ্লবিক কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন আলেকজান্ডার ফ্লেমিং। তারপরে দেখুন ডা. ওয়াকসম্যান আবিষ্কার করলেন স্ট্রেপটোমাইসিন। যক্ষ্মার বিরুদ্ধে লড়ার হাতিয়ার এসে গেলো চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আয়ত্তে। এভাবেই একের পর এক ওষুধের আবিষ্কার, যাচাই-পরীক্ষা হয়েছে। সবই বহুজন হিত সুখের জন্যে। সর্বজনের নিরাময়ের তাগিদে। একেকটা নতুন ওষুধ যাচাই পরীক্ষার পর বাজারে আসার ছাড়পত্র পায়। তারপর চলে অঙ্ক-কষা বাণিজ্য বিস্তার। তারমধ্যে ভালো-মন্দ দুরকম দিকই জড়িয়ে আছে। ক্যানসার-এর সঙ্গে লড়াই করার জন্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা ক্রমাগত গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। আর ওষুধ প্রয়োগ করে দেখার জন্যে নানারকম উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর জেলার পিডিগুরালা গ্রামের কিছু নারী পুরুষকে ক্যান্সারের এক ওষুধ প্রয়োগের জন্যে বেছে নেওয়ার পর কোন্ অবস্থা দাঁড়াল? নারীরা সংখ্যায় বেশি ছিলেন, পুরুষরা কম।

ওষুধটা ছিল স্তন-ক্যানসার প্রতিরোধী ওষুধ। হায়দরাবাদের মিয়াপুর এলাকার চুনা পাথরের খনির মহিলা শ্রমিকদের বেছে নিয়েছিল ওষুধ যাচাই-এর ভারপ্রাপ্ত সংস্থা। গত ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসে দফায় দফায় চারদিন করে অ্যাকসিস ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে রেখে পরীক্ষা চালানো হয়। যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা ক্যান্সারে আক্রান্ত। ওষুধ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মূত্র ও রক্তের নমুনা কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে নিয়মিত নেওয়া হয়। তারপর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয় পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে।

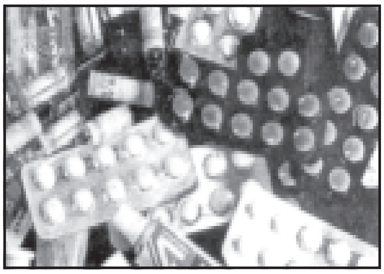

এই পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে প্রত্যেকে পেয়েছেন দশ হাজার করে টাকা। আশ্বাস দেওয়া হয় একই সঙ্গে ওষুধ যাচাই পরীক্ষায় সাফল্য এলে আরও তিরিশ হাজার টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু পরীক্ষার ফল সকলের ক্ষেত্রে অনুকূলে যায়নি। এক মহিলার বেশ কিছু শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। তাঁর ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা শুরু হয় গাঁটে গাঁটে। ক্রমাগত বাড়ে বমনেচ্ছা। মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। আর দেখা দেয় বুকে ব্যথা। যে সংস্থা ওইরকম পরীক্ষা চালিয়েছে তার বেশ নামডাক রয়েছে ওষুধ তৈরি এবং বিপণনের ক্ষেত্রে। একজন মহিলার ওইরকম শারীরিক প্রতিক্রিয়ার পর অন্যদের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে।

কাগজপত্র ঘেঁটে মহিলাদের সম্পর্কে তথ্য মেলে। সকলেই গরিব। কেউ কেউ একা থাকেন অসুস্থ সন্তানকে নিয়ে। অনেকে ঋণভারে জড়িত। কেউ দশ হাজার টাকা পেয়ে বাড়ির অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করার কথা ভেবেছেন।

ব্যাপারটা চেপে রাখা সম্ভব হয়নি। রাজ্য সরকারের নজরে এসেছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব পি ভি রমেশ বলেছেন, মহিলাদের শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ নয়। মানুষের উপর ওষুধের পরীক্ষা স্বাভাবিক। আমরা আজ অনেক ওষুধ যথেচ্ছ ব্যবহার করছি তা পেতাম না মানুষর উপর প্রয়োগ করে সাফল্য না পেলে। তবে আমরা ব্যাপারটা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি। কারণ এর সঙ্গে গণমাধ্যম জড়িত আছে। ওষুধ উৎপাদক সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ওধুধের পরীক্ষার ক্ষেত্রে যেসব বিধিনিয়ম রয়েছে তার কোনটাই অমান্য করা হয়নি এক্ষেত্রেও।

এর আগে ২০০৯ সালে অন্ধ্রপ্রদেশে ওষুধ পরীক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে। জরায়ুর ক্যান্সার রোধ করার জন্য একটি ওষুধের প্রয়োগের জন্যে বাছা হয় খাম্মাম জেলার জনজাতি কল্যাণ সংস্থার অপ্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রীদের। একটি বেসরকারি সংস্থা ১৪ হাজার কন্যাকে ইনজেকশন দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিল। পাঁচটি কন্যার মৃত্যুর পর ওই পরিকল্পনা বাতিল হয়। দেখা যায়, কন্যাদের কাছ থেকে তাদের সম্মতিপত্র নেওয়া হয়েছিল সেগুলোর প্রত্যেকটি সই করেছিল হসটেলের ওয়ার্ডেন। তার বুড়ো আঙুলের ছাপ ছিল। তাতে বোঝা যায় কিছু অসৎ লোক এসব কাজে যুক্ত হয়েছিল। যাদের ওপর ওষুধ প্রয়োগ করা হয়েছে তাদের কিছুই জানানোর ব্যবস্থা থাকেনি। প্রচুর রোগী পাওয়া যাবে—এমন ভেবেই ওষুধ কোম্পানির হয়ে কিছু দালাল শ্রেণীর লোক আর্থিক লোভে এধরনের কাজ করে। ফলে পুরো ব্যাপারটাই সমস্যায় ভরে গেছে।

বিদেশি ওষুধ উৎপাদক সংস্থা কেন বেছে নিয়েছে ভারতের রোগীদের? এক্ষেত্রে কাজ করছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বেসরকারি হাসপাতাল। হায়দরাবাদে বেসরকারি উদ্যোগের হাসপাতাল অনেক। যে ওষুধের যাচাই পরীক্ষা করা দরকার তা ইউরোপ আমেরিকায় করতে গেলে যত অর্থের প্রয়োজন হয় ভারতে সেটা সম্ভব ষাট শতাংশ কম টাকায়।

শুধু অন্ধ্রপ্রদেশে ওষুধ কোম্পানিগুলো ৪৫৫ কোটি টাকা খরচ করছে। আর দালালরা কোম্পানির পক্ষ থেকে ওষুধ পরীক্ষার জন্যে বিভিন্ন জেলার দরিদ্র বাসিন্দাদের টোপ দিয়ে হায়দরাবাদে নিয়ে আসছে। এসব ওষুধ কোম্পানির পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল ক্ষতিকর হওয়া সত্ত্বেও কোনওরকম প্রতিরোধী ব্যবস্থা নেওয়ার গরজ দেখা যাচ্ছে না কোনও স্তরে।

চিঠিপত্র

বাজারীর বানানো গল্পকথা

বহুল প্রচারিত বলে দাবী করে এমন এক বাংলা দৈনিকের (৪.৬.১১) সম্পাদকীয় পাতায় জনৈক গৌতম রায়ের নিবন্ধ— ‘‘হিন্দুত্ববাদীদের বানানো রূপকথা’’ নিবন্ধটি প্রসঙ্গে স্বাভাবিক কয়েকটি প্রশ্ন জাগে। শ্রী রায় লিখেছেন—

১। ‘‘শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত বেকার মুসলিম যুবক ভাইবোন’’। প্রশ্ন : পশ্চিমবঙ্গে বিগত বামফ্রন্টের দীর্ঘ ৩৪ বছরের অপশাসনে কি কেবলমাত্র শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত মুসলিম ভাইবোনেরা? দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম তপসিলি, আদিবাসী, উপজাতি ও নিম্নবর্ণের পিছিয়ে পড়া অসংখ্য হিন্দু ভাইবোনেরা নন? প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে খোঁজ নিলেই জানা যাবে কত গরীব ঘরের হিন্দু ভাইবোন সামান্য জীবিকার সন্ধানে ভিনরাজ্য— গুজরাট, মুম্বাই, পুনা, ব্যাঙ্গালোর, দিল্লী প্রভৃতি নানা শহরে পাড়ি দিয়েছে— নিবন্ধকার কি তাদের খোঁজ রাখেন? আজ রাজ্যে মাওবাদী সমস্যা এত প্রকট কেন?

২। ‘‘সরকারি উদ্যোগে মুসলিম মহল্লায় কোনও স্কুল তৈরি হয়নি...’’

বামফ্রন্ট শাসনকালে কয়টি কেবল হিন্দু মহল্লায় সরকারি উদ্যোগে স্কুল, ছাত্রাবাস তৈরি হয়েছে জানাবেন কি? আর মৌলানা-মৌলবী চালিত মুসলিম সমাজের অভিভাবকেরা মক্তব-মাদ্রাসার পরিবর্তে সরকারি সাধারণ স্কুলে নিজের পছন্দমতো সন্তানদের ভর্তি করতে, পড়াতে পারবেন তো?

আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের সংবিধানে শিক্ষায় ও চাকুরীর সুযোগ সুবিধায় হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের ক্ষেত্রে কোনও বাধা নিষেধ, ভেদাভেদ ও বৈষম্যের বিধান আছে কি? ভারতের সংবিধান মোতাবেকেই দেশের সর্বোচ্চ পদ—যথা রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি এমনকী নানা সেনাধ্যক্ষ পদেও মুসলিম ব্যক্তিত্বগণ আসীন ছিলেন বা এখনও আছেন— অস্বীকার করতে পারেন কি?

৩। ‘‘আধুনিক প্রযুক্তির অনুপ্রবেশে... মহানগরীর গোঁড়া মুসলিম সমাজকে বেরোজগারির অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে’’— কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে— আধুনিক প্রযুক্তির অনুপ্রবেশ সকল সম্প্রদায়ের দরিদ্র সমাজকেই বেরোজগারির অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে। তাই নয় কি?

৪। বেশ কিছুকাল আগের ঘটনায় কলকাতার গার্ডেনরিচ খিদিরপুর এলাকায় কর্তব্যরত পুলিশ কমিশনারকে (ডি সি পোর্ট) নৃশংসভাবে খুনের ঘটনাটি মনে পড়ে কি? যখন তখন মুসলিম মহল্লায় ‘‘পাকিস্তান-জিন্দাবাদ’’ ধ্বনি, যখন তখন ‘‘দাঙ্গা বাধানো’’ কি— ‘কলকাতায় মুসলমানদের সর্বদা সন্তর্পণে থাকার’ নমুনা?

৫। ‘খোলা আকাশের নীচে’ একটি মুসলিম পরিবারে কয়টি শিশু আছে গুনতি করে দেখেছেন কি নিবন্ধকার মহাশয়? অথচ চীন যেখানে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ‘‘এক পরিবার— এক সন্তান’’ নীতি কার্যকরী করেছে— সেখানে আমাদের ভারতে বসবাস করে ‘‘হাম দো— হামারা দো’’ নীতিকে মান্য করার ন্যূনতম কোন দায় বহন করে কি বৃহত্তর মুসলিম সমাজ?

৬। জেরেমি সিব্রুক এবং ইমরান সিদ্দিকি সাহেব কলকাতার বস্তিগুলিতে প্রকৃত ‘ভারতীয়’ মুসলমান নাগরিক কতজন আর কতজনই বা ‘অনুপ্রবেশকারী ভিন্ রাষ্ট্রের নাগরিক’ তা খতিয়ে দেখেছেন কি? ভিন্ রাষ্ট্র থেকে আসা বেআইনী ভাবে অসংখ্য অনুপ্রবেশকারীদের দায় কি ভারত সরকারের না বামফ্রন্ট সরকারের? স্বাধীনোত্তরকালে স্বল্প সময়ের মধ্যেই পশ্চিমবাংলার সীমান্তবর্তী ৭ থেকে ৯টি জেলায় মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় কি করে? নিবন্ধকার মহাশয় ব্যাখ্যা দেবেন কি? ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য কেরালায় কমিউনিস্ট পার্টি সরকারে আসীন থাকাকালীন কেরালা রাজ্যের একটি জেলা ‘মালাপ্পুরম’কে সরকারি ভাবে ‘মুসলিম জেলা’ হিসেবে ঘোষণা ক’রে সরকারি স্বীকৃতি দিয়েছেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ— সেই সিপিএম কি কেবল মুসলিমদের প্রতি বৈষম্য, অনাদর ও উপেক্ষা লালন করবে? বিশ্বাস্য কি?

কার্যত সিপিএমের বৈষম্য, অনাদর ও উপেক্ষা রাজ্যের সকল অ-সিপিএম মানুষের জন্যই বরাদ্দ ছিল।

৮। লিখেছেন— ‘‘শতাংশের হিসাবে খুব কম সংখ্যক মুসলমান তরুণই অপরাধ জগতে নাম লেখায়...’’। কিন্তু বাস্তব চিত্রটা কি? রাজ্যের তথা সমগ্র দেশের যে কোনও থানায়, পুলিশ চৌকিতে অপরাধীদের তালিকা পরীক্ষা করলেই কি পরিষ্কার হবে না যে— অধিকাংশ অপরাধীই মুসলিম সম্প্রদায়ের? রাজ্যে বিশেষত সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, জাল নোটের কারবার, মাদক পাচার, নারী ও শিশু পাচার, মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র পাচারের মতো অপরাধমূলক ঘটনাগুলিতে যারা পুলিশের জালে ধরা পড়ছে প্রতিদিনই তাদের সিংহভাগই মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। এমনকী মুসলিম মহিলারা পর্যন্ত। তবে যেমন সব মুসলিমই অপরাধী নয়— কিন্তু অপরাধীদের অধিকাংশই সর্বক্ষেত্রেই মুসলমান— এ বিষয়টা অস্বীকার করা যাবে কি?

তাই মাননীয় স্বচ্ছদৃষ্টির পাঠকবর্গ গৌতম রায়ের নিবন্ধটির শিরোনাম বানানো গল্পকথা নয় ‘‘কল্পকথা’’ লিখলেই সঠিক হবে— আপনারাই নির্ধারণ করে দিন, এই বিনীত অনুরোধ।

—শান্তি রায়, পাটনাবাজার, পশ্চিম মেদিনীপুর।

বি জে পি ও আমরা

স্বস্তিকা ২৩ জুন, ৩৯ সংখ্যায় রাজু হালদার (চিঠিপত্র) বিজেপি’র নিষ্ক্রিয়তার কথা বলেছেন। ৩২/৩৩ বছর হলো বিজেপি’র জন্ম হয়েছে। সেই থেকে এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে এই দল সদস্য সংগ্রহ অভিযান আজও চালু করতে পারেনি। কিন্তু তবুও আমরা এর অনুগামী হিন্দুদের স্বার্থবাহী বলে। এদের খুঁজে পাওয়াই কঠিন। বলতে গেলে হিন্দী বলয়েরই দল এটা। পূর্ব ভারতটা বাংলাদেশ কবলিত হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, কিন্তু বিজেপি নির্বিকার। হাতে কজন নেতা ছাড়া বলতে গেলে দলটাই অনেকটা কাগজে কলমে আবদ্ধ।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় যে এক কোটিরও বেশি মুসলমান পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে পড়ে তাদের কংগ্রেস ও বামেরা একযোগে নাগরিকত্ব দেয় এবং পশ্চিমবঙ্গে demographic চিত্র বদল করে দিয়েছে। বিজেপি নির্বিকার। বিজেপি মুসলিম ভোটের আশায় (যদিও কোনও মুসলমান তাদের কোনও দিন একটি ভোটও দেবে না) হিন্দুস্বার্থবাহী কাজ করে না। এখনই তৃণমূলের হিসাবে ১২৫টি আসনে মুসলমান ভোট নির্ভর— মুসলমানরা এক যোগে ভোট দেয় অর্থাৎ তারা রাজনৈতিক ভাবে একতাবদ্ধ এবং এই সুবাদে বহু অন্যায় সুযোগ আদায় করে নিচ্ছে। ক্রমাগত অনুপ্রবেশের দ্বারা তারা শীঘ্রই আসনের গরিষ্ঠ অংশ দাবী করবে। অর্থাৎ হিন্দুরা মুসলমানদের উপর চিরনির্ভর থাকবে।

এমতাবস্থায় আমাদের একটা পথই খোলা আছে— সমবেত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে ও বাংলাদেশের মধ্যে লোক বিনিময় করা। কেন্দ্র এতে রাজী হবে না, তারা গাঁধী-নেহরু হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের স্বপ্নে বিভোর, তাই আমাদের রাষ্ট্রসঙ্ঘের দ্বারস্থ হয়ে সেখানে আর্জি জানানো দরকার। এটাই সমস্ত বাঙালির আত্মরক্ষার উপায়।

—ভূপতি চরণ দে, সন্তোষপুর, কলকাতা-৭৫।

মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা ন্যায় বিচারের দিন গুণছে

অসিতবরণ ঠাকুর

১৭ জুন ২০১১ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় ঘোষণা করেন যে 'মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু গণহত্যার' বিচার বিভাগীয় তদন্ত হবে। এই ঘোষণায় মরিচঝাঁপি গণহত্যায় সর্বস্বান্ত হয়ে পথে-ঘাটে পড়ে থাকা উদ্বাস্তুরা ন্যায় বিচারের আশায় চনমনিয়ে উঠেছেন। উদ্বাস্তু আন্দোলনের গণসংগঠন, মানবাধিকার কর্মী ও পরিবর্তনকামীরাও এই খবরে খুব খুশি। এত অল্প দিনের মধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একের পর এক প্রাক্ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের ঘোষণায় বাংলার বাম অপশাসনে বিধ্বস্ত মানুষেরা উল্লসিত। তারা নতুন বাংলা গড়াতে প্রস্তুত। শুধু দরকার সঠিক নেতৃত্ব, দিশা ও লক্ষমুখি কার্যক্রম। যোগ্য মানুষ চয়ন ও তাঁদের কর্মক্ষমতা ব্যবহারের উপযুক্ত বাতাবরণ সৃষ্টি দরকার। তবে খেয়াল রাখতে হবে ভুলেও যেন বেনোজল না ঢোকে। তাহলে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সদ্য জেগে ওঠা মরিচঝাঁপি দ্বীপে (সরকারী সংরক্ষিত বনাঞ্চল নয়) প্রায় ৩০ হাজার রুক্ষ দণ্ডক ফেরৎ কৃষিনির্ভর উদ্বাস্তুদের নিজচেষ্টায় বেঁচে থাকার ৯ মাসের জীবন সংগ্রামের করুণ ইতিহাস ইতিমধ্যে সবার জানা হয়ে গেছে। স্বাধীনোত্তর কালের প্রথম পৈশাচিক গণহত্যা ঘটিয়েছিল সদ্য অপসৃত বাম তকমার সিপিএম পরিচালিত তথাকথিত গরিব দরদী বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৮-৭৯ সালে। কত যে অগুন্তি নিরীহ নর-নারী, শিশু-বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী পুলিশ-ক্যাডারের দানবীয় অত্যাচারের শিকার হয়ে হারিয়ে বা পঙ্গু হয়ে গেছে তার সঠিক হিসাব আজও কেউ দিতে পারেনি। এক গবেষক বলেছেন প্রায় ১৭ হাজার উদ্বাস্তু আর দণ্ডকের ক্যাম্পে ফিরে যায়নি। মরিচঝাঁপি থেকে উৎখাত হওয়া উদ্বাস্তুরা আজ কোথায় বা তারা কেমন আছে তারও খোঁজ কেউ রাখে না।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন সরকার তারই সত্য উদ্ঘাটনে ব্রতী হয়েছে। সুদীর্ঘ ৩৪ বৎসর পরে এই তদন্ত কমিশন কতটা তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে ও দোষীদের চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারবে তা এখনি অনুমান করা সম্ভব নয়। তবে তৎকালীন ঘটনার তথ্য বহু পুস্তক/পুস্তিকা/সিডি-তে ইতিমধ্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বেচে আছে বহু প্রত্যক্ষদর্শী, ভুক্তভোগী, অত্যাচার- গণহত্যায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত তৎকালীন শাসককুল, পুলিশ, আমলা ও ক্যাডার। ১৫/১৬ দিন ধরে চলা মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী হয়েছিল মরিচঝাঁপির মাটি-জল-জঙ্গল ও তার পারিপার্শ্বিক স্থানের বসবাসকারীরা এবং সরকারী-হাইকোর্টের নথিপত্র। এই তদন্ত তাই সময় সাপেক্ষ ও জটিল হতে বাধ্য। তদন্ত কমিশন অভিজ্ঞ ও যোগ্যতাসম্পন্ন একাধিক সদস্যবিশিষ্ট হওয়া তাই জরুরী। মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের আগমনের কারণ, তাদের প্রায় ৯ মাস কাল অবর্ণনীয় পরিস্থিতিতে বসবাস, তৎকালীন সরকার ও রাজনৈতিক দলের উদ্বাস্তুনীতি ও মনোভাব এবং সর্বোপরি ক্ষতিগ্রস্ত উদ্বাস্তুদের স্বজন-সম্পত্তি হারানোর উপযুক্ত ক্ষতিপূরণসহ সুষ্ঠু ও সার্বিক পুনর্বাসনের দিক নির্ণয় কমিশনের বিচার্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার।

২৮ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখের মতুয়া মহাসংঘের নেতৃত্বে লক্ষাধিক মানুষের কলকাতার মহাসম্মেলনে বাঙালি উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার যে সর্বদলীয় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা এখনই পূরণ করা দরকার। নচেৎ প্রায় ২ কোটি বাঙালি উদ্বাস্তু নাগরিকত্বহীন দুঃখ-দুর্দশার হাত থেকে মুক্তি পাবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন সরকারের বাঙালি উদ্বাস্তুদের এই 'জ্বলন্ত মানবিক সমস্যার' সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া দরকার। এটা তাঁর 'নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির' মধ্যেই পড়ে।

কেন্দ্রীয় সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সক্রিয় সমর্থন ছাড়া একদিনও টিকবে না। তাছাড়া বাংলায় এখন 'তৃণমূল কংগ্রেস-কংগ্রেস জোট' সরকার। কংগ্রেসেরও দায়বদ্ধতা আছে। রাজ্য কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি ও বর্তমান রাজ্য সরকারের সেচ মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার সর্বদলীয় প্রতিশ্রুতির অন্যতম শরিক। বিধানসভায় উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার সরকারি প্রস্তাব আনলে বিরোধী পক্ষও তা সমর্থন করতে বাধ্য হবেন।

বিরোধী পক্ষের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা ছিল এবং তারাও ২৮ ডিসেম্বরের সর্বদলীয় প্রতিশ্রুতির শরিক। সর্বসম্মত প্রস্তাবটি বিধানসভায় পাশ করিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়ে উদ্বাস্তুদের (১৯৭১-এর পরে আসা উদ্বাস্তু সহ) নাগরিকত্ব দেওয়ার সংস্থানের জন্য নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন, ২০০৩ পুনরায় সংশোধনের দাবী জানাতে হবে এবং ২৫ মার্চ ১৯৭১ সালের পরে আসা উদ্বাস্তুদের ১৯৭২ সালের নাগরিকত্ব দেওয়ার নিষেধাজ্ঞার আদেশনামা তুলতে হবে।

পূর্বতন বাম জমানায় রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিকভাবে অত্যাচারিত ও শোষিত বাঙালি উদ্বাস্তুদের রক্ষা ও হয়রানি থেকে বাঁচাতে এবং তাদের বাংলার উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে সামিল করতে মমতা সরকারের নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি আশু পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।

১। রাষ্ট্রসংঘের উদ্বাস্তু রক্ষাকবচ ও নীতি-বিধি ভঙ্গ করে 'বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী' তকমায় অসহায় বাঙালি উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে ১৯৪৬ সালের বিদেশী আইনের ১৪ নং ধারায় আনীত মামলাগুলোকে চিহ্নিত করে অনতিবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।

২। ভবিষ্যতে বাঙালি উদ্বাস্তুদের 'বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী' তকমায় ১৯৪৬ সালের 'বিদেশী আইনে' বা ২০০৩ সালের সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে পুলিশি গ্রেপ্তার ও হয়রানী রোধ করতে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক নির্দেশনামা জারি করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের দেওয়া বৈধ নাগরিকত্ব সংশাপত্র প্রাপকদের 'বাংলাদেশী শিক্ষাগত যোগ্যতার সংশাপত্র' থাকার অজুহাতে 'বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী' তকমা দিয়ে বিদেশী আইনে গ্রেপ্তার করার অবৈধ কাজ (১৯৫৫ সালের নাগবিকত্ব আইনের ১০ ধারা লঙ্ঘন করে) বন্ধ করে সেই সমস্ত বৈধ সংশাপত্র কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিগত স্বীদ্ধান্ত ও নির্দেশ অনুসারে বৈধতাপ্রদান (Regularisation) করার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা কর্মস্থলে হয়রানির শিকার না হন। বহু আবেদন-নিবেদন ও লেখালেখি সত্ত্বেও বঙ্গবাসী কলেজিয়েট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবলু ভট্টাচার্য ও মধ্যমগ্রাম হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সঞ্জীব সরকার আজও Regularisation- এর অভাবে হয়রানী মুক্ত হতে পারেননি। তেমনি রানাঘাটের ধানতলা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কল্লোল বিশ্বাস 'জন্মগত নাগরিক' হওয়া সত্ত্বেও (ভারতীয় পাসপোর্টও আছে) 'বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী' তকমায় বিদেশী আইনের কেসে ফেসে সুদীর্ঘ প্রায় ৩ বৎসরকার স্কুলে প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে হয়রান হচ্ছেন।

এর সমাধানে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

Logo: পরম্পরা

চৈতন্য যুগের পরবর্তীকালে নতুন ধারার মন্দির

।। পর্ব — ১।।

প্রণব রায়

একসময় ছিল যখন মন্দিরময় ভারতে বাংলার মন্দিরও উজ্জ্বল স্থান অধিকার করেছিল। প্রাচীন বাংলায় বিশেষ করে পাল-সেন আমলে ইঁট ও পাথরের সু-উচ্চ অনেক দেব-দেউল বাংলার নানা স্থানে তৈরি হয়। মুসলমান-আক্রমণে তার প্রায় সবই ধ্বংস হয়ে গেছে।

বাংলার মন্দিরে মন্দিরে

ভগ্ন মন্দির, চন্দ্রকোণা শহর (পঃ মেদিনীপুর), রঘুনাথবাড়ি, অযোধ্যা।

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরের কোনও কোনও স্থানে আজও তার কিছু চিহ্ন পাওয়া যায়। বাঁকুড়ার সোনাতপল ও বহুলাড়ায় এখনও পাল-সেন আমলের ইঁটের মন্দির কিছুটা অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। সোনাতপলের পরিত্যক্ত মন্দির এখনও পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের দ্বারা অনেকটা নতুন কলেবর ধারণ করেছে। বর্ধমানের সাতদেউলিয়ার পাল-সেন আমলের মন্দিরও পরিবর্তিত রূপ লাভ করেছে।

মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবের পরে বাংলার মন্দিরচর্চায় যে নতুন ধারার পত্তন হলো, তার ফলে চালা, বাংলা, চাঁদনি, রত্ন ও দেউল মন্দির অজস্র নির্মিত হয়েছিল। এই নতুন ধারার মন্দির পশ্চিমবাংলার কোনও কোনও স্থানে বিপুল সংখ্যায় নির্মিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— বাঁশবেড়িয়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা, ঘাটাল, দাসপুর প্রভৃতি স্থান। প্রথমে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার চন্দ্রকোণার মন্দির নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এখানকার অনেক মন্দিরের অবস্থা খুবই শোচনীয়, ভগ্নপ্রায় ও বিধ্বস্ত। মধ্যযুগের পূর্বোক্ত শৈলীর প্রায় সব মন্দিরই এখানে নির্মিত হয়। কিন্তু প্রাচীন মন্দিরগুলির প্রায় সবই আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত।

চন্দ্রকোণা শহর একসময় 'ভান'-রাজ্যের রাজধানী ছিল। খৃস্টীয় ষোল শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে সতের শতক পর্যন্ত 'ভান'-বংশীয় রাজারা এখানে রাজত্ব করতেন। এঁরা হলেন চন্দ্রভান, বীরভান, হরিভান ও মিত্রসেন। বীরভানের পুত্রবধূ হরিভানের মহিষী লক্ষ্মণাবতীরও খুব নাম ছিল। লক্ষ্মণাবতীর পুত্র রাজা মিত্রসেন। তারপর যুদ্ধ বিগ্রহ ও অভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য 'ভান'-রাজ্যের পতন নয়। ভান-বংশের সঙ্গে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজবংশের আত্মীয়তা থাকায় পরবর্তী কিছুকাল এই রাজ্য তাঁদের অধিকারে আসে। এর অল্প দিন পরে বর্ধমানের মহারাজা প্রবলপ্রতাপশালী কীর্তিচাঁদের কেতুয়া-বরদার জমিদার শোভা সিংহের বিদ্রোহ দমনকালে চন্দ্রকোণা ও বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁর অধিকারে আসে। চন্দ্রকোণার অনেক মন্দির সেসময় বিধ্বস্ত হলেও নতুন কোনও কোনও মন্দির নির্মিত হয়। তার মধ্যে চন্দ্রকোণা শহরের অযোধ্যা পল্লীর 'রঘুনাথবাড়ি'র মন্দিরগুলি সম্ভবত কীর্তিচাঁদ নির্মাণ করেন।

চন্দ্রকোণার 'রঘুনাথবাড়ি'র রঘুনাথজীউর দেউলের এক অংশ (প্রায় বিধ্বস্ত)

এই ঠাকুরবাড়ি একসময় খুবই দর্শনীয় ছিল। এই স্থান তীর্থযাত্রীদের বিশ্রামস্থলও ছিল। রঘুনাথজীউ, লালজীউর সুদৃশ্য মন্দির, 'তোষাখানা', নাটমন্দির, ভোগঘর সেকালে খুবই দৃষ্টিনন্দন হয়ে ওঠে। অতিথিশালাও ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে এগুলি দৈন্যদশায় উপনীত, ভগ্ন, জীর্ণ ও বিধ্বস্ত।

চন্দ্রকোণার খিড়কিবাজারের রাধাকৃষ্ণের প্রসিদ্ধ 'জোড়বাংলা'। আনুমানিক খৃঃ ১৭ শতক।

গর্ব নাশ, বিনয় প্রকাশ

রাজার অনেক দায়িত্ব। অনেক ভাবনাও। হঠাৎ কোনও বিষয় তাঁর মাথায় এলে ঠিকমতো জবাব পাওয়ার জন্য ছটফট করেন। রাতে ভালো ঘুম হয় না দামী পালঙ্কে শুয়ে। রাজার পরিচারকরা কিছু বুঝতে পারে না। শুধু দেখে কেমন এক অস্থিরতা রাজার মধ্যে। যখন কোন সমস্যা দেখা দেয় তখন রাজা ভালোভাবে ঘুমোন না, খান না। কোনও কাজে মন দিতে পারেন না। রাজা তাঁর মর্যাদায় বেশ গর্বিত। তবে তাঁর কাজের মধ্যে মহৎ হৃদয়ের পরিচয়ও থাকে। রাজার আশপাশে যারা থাকে তারা সেটা ভালোভাবে জানে। অস্থির মন নিয়ে কোনও কাজ ঠিকভাবে করা সম্ভব নয়। রাজা ঠিক করলেন রাজসভায় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নেবেন। তিনি অনেক সমস্যা সমাধানে সাহায্য করেন। রাজার মনের গভীরে পাক খেতে থাকা জিজ্ঞাসার উত্তর হয়তো জানা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর।

রাজসভা বসেছে যথাসময়ে। সবাই হাজির। রাজা আসছেন খবর এলো। প্রথা মেনে রাজা এলেন রাজসভায়। রাজা প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সকলে দাঁড়ালেন। রাজা আসন গ্রহণ করতে সকলে বসলেন। সভার কাজ শুরুর পর, রাজা প্রধানমন্ত্রীকে বললেন, 'আমি কদিন ধরে একটা সমস্যা নিয়ে বড়ো দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছি।' প্রধানমন্ত্রী পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে সব শুনতে চাইলেন।

রাজা বললেন, 'আচ্ছা আমাদের প্রত্যেকের কিছু-না-কিছু কাজ রয়েছে। আমার কাজ হলো রাজ্য শাসন করা। যোদ্ধার কাজ যুদ্ধ করা। বণিকের কাজ বাণিজ্য ঠিকভাবে চালানো। ধর্মগুরুর কাজ সাধারণ মানুষকে ধর্মপ্রবণ করে তোলা। আপনারও কাজ আছে রাজ্য পরিচালনায় আমাকে সাহায্য করা। অন্যান্য ক্ষেত্রেও যাঁরা আছেন, তাঁদেরও নির্দিষ্ট কাজ আছে। কিন্তু তাঁর কাজটা কি?' প্রধানমন্ত্রী সবিনয়ে প্রশ্ন করলেন, 'মহারাজ কার কথা বলছেন, ঠিক বুঝতে পারছি না!' রাজা বললেন, 'স্রষ্টার কথা বলছি। যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন শুনেছি। তাঁর আসল কাজটা কি? আমার এই প্রশ্নের উত্তর চাই চটপট। এজন্যে আমার রাতের ঘুম উধাও হয়ে গেছে।'

প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'ঠিকই। আমাদের মধ্যে কার এই প্রশ্নের উত্তর জানা আছে তা খুঁজে বের করতে হবে।'

রাজা বললেন, 'দেরি করবেন না।'

প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'আমার মনেও মাঝে মাঝে একই প্রশ্ন উঁকি দেয়। কিন্তু কোন উত্তর আমারও তো জানা নেই। আমার কাজ আপনাকে পরামর্শ দেওয়া। আমার মনে হয় এ ব্যাপারে যথাযথ উত্তর দিতে পারবেন ধর্মগুরু। কারণ তাঁরা ঈশ্বরের ধ্যান করেন সবসময়।' রাজার নির্দেশে ডাকা হলো ধর্মগুরুকে। তিনি এসে সব শোনার পর বললেন, 'আমাকে সাতটা দিন সময় দিন। এত কঠিন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সময় লাগবে।'

ধর্মগুরু তো মহাচিন্তায় পড়লেন। রাজার কাছে সময় চেয়েছেন এক সপ্তাহ। কিন্তু কোনও উত্তরই তো খুঁজে পাচ্ছেন না। বিষণ্ণ মনে এক দিগন্তবিস্তৃত মাঠের সামনে প্রশস্ত গাছতলায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন আর ভেবে চলেছেন। রাজার মুখোমুখি হতে হবে। কিন্তু ঠিকমতো উত্তর না দিলে রাজা অসন্তুষ্ট হয়ে অনেক কথা বলতে পারেন।

ধর্মগুরুকে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিল এক রাখাল বালক। সে প্রতিদিন ওই বিশাল ক্ষেতে পশুদের গিয়ে আসে চরাবার জন্যে। সেটাই তার কাজ। গাছের তলায় বসে বাঁশি বাজায়। গান গায়। দিনের শেষে একটা মহিষের পিঠে চড়ে বাঁশি বাজাতে বাজাতে ঘরে ফেরে।

সে পায়ে পায়ে এগিয়ে ধর্মগুরুকে প্রণাম করে বলল, 'মনে হয় আপনি বড় বেশি দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছেন। যদি কিছু না ভাবেন আমাকে বলতে পারেন। আমি পশুচরানো অল্পবুদ্ধির মানুষ হলেও সহজভাবে আপনার সমস্যার কথা ভাবতে পারি।'

ধর্মগুরু সমস্যার জন্যে বিব্রত। কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। এক প্রাণবন্ত সাধারণ বালক ওইভাবে সবকিছু সহজ ভঙ্গিতে দেখার মন নিয়ে এগিয়ে আসায় চমকে গেলেন তিনি। নিজের সমস্যার কথা বললেন।

রাখাল বালক বলল, 'প্রভু, আপনার সমস্যার কথা শুনলাম। আপনি শান্ত মনে রাজার কাছে যান। তাঁকে বলুন, আপনার প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। তবে আমার চেনা এক রাখাল বালক উত্তর জানে। মহারাজার অনুমতি পেলে তাকে এই রাজসভায় আনতে পারি।'

ধর্মগুরু তাই করলেন।

মহারাজা বললেন, 'ঠিক আছে সেই রাখাল বালক আসুক রাজসভায়।'

রাখাল বালককে রাজসভায় ডাকা হলো। তাকে দেখে অনেকে চমকে গেলো। এমন এক অতি সাধারণ বালক রাজসভায় এত খাতির পাচ্ছে কেন?

বালক এগিয়ে এসে রাজাকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, 'আপনার সমস্যার কথা শুনেছি। উত্তর আমার জানা আছে।'

রাজা বললেন, 'আমার ধৈর্যে কুলোচ্ছে না। তুমি চটপট বলো।'

বালক বলল, 'দেখুন শাস্ত্রের নিয়মে আপনি যদি প্রশ্ন করেন তাহলে আপনি ছাত্র। আর সেই উত্তর যদি আমাকে দিতে হয় তাহলে আমি গুরু। গুরু হিসেবে যদি আমাকে যথাযথ মর্যাদা দেন তাহলেই আমি উত্তর দিতে রাজি।'

রাজা বললেন, 'কি করতে হবে আমাকে?'

রাখাল বালক বলল, 'গুরুর আসন সবসময় উপরে। শিষ্যের আসন নিচে। আপনাকে নিচে নামতে হবে। সিংহাসন থেকে নিচে নামুন। ওই আসনে আমাকে বসতে দিন। আমি গুরুর ভূমিকা নেবো। আপনি শিষ্যের ভূমিকায় নিচে বসবেন।'

রাজা সব মেনে নিতে রাজি হলেন। সভার লোকজন তো বালকের ঔদ্ধত্য দেখে অবাক।

সিংহাসনে বসে বালক বলল, 'প্রশ্নের উত্তর আমি দেবো।' রাজা বললেন, 'আমার আর ধৈর্যে কুলোচ্ছে না। চটপট জানতে চাই স্রষ্টার কাজ কি।'

বালক সিংহাসনে বসে চারপাশ ভালো করে দেখল। এই আসনে বসে রাজা দর্পিত ভঙ্গিতে সব শাসন করেন। ভাবেন, তিনি প্রবল পরাক্রান্ত। সবকিছু তাঁর মুঠোর মধ্যে।

রাখাল বালক ভাবছিল আমি দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয় গান গাইতে গাইতে মনের আনন্দে ঘুরতে পারি। রাজা সত্যিই বন্দী। তাঁর মোহ, গর্ব আর দর্পের গণ্ডীতে।

রাজা বললেন, 'কি হলো উত্তর আমার প্রশ্নের?'

রাখাল বলল, 'স্রষ্টার একটাই কাজ একটাই কথা, ঠেলে নামাও গর্ব অহঙ্কারকে। আর ঠেলে তোল বিনয় নম্র ভালোবাসাকে। এইটাই স্রষ্টা নানাভাবে করে চলেছেন।'

এই উত্তর দিয়ে রাখাল বালক চলে গেলো বাইরে। সে তখন বাঁশিতে সুর তুলেছে, আমার মুক্তি আলোয় আলোয়। কারও ডাকে সাড়া দিল না। রাজা প্রধানমন্ত্রীকে বললেন, 'উত্তর আমি পেয়ে গেছি।'

ঐতিহাসিক দুর্গ জয়সলমীর

সোমশুভ্র চক্রবর্তী

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে, থর মরুভূমির মধ্যে স্থাপিত জয়সলমীর দুর্গের গুরুত্ব অপরিসীম। ১১৫৬ খৃস্টাব্দে ভাটী রাজপুতদের নতুন রাজধানী রূপে মহারাওল জয়সল্ ত্রিকূট পাহাড়ে জয়সলমীর নগরী তথা জয়সলমীর দুর্গের গোড়াপত্তন করেন। বীরভূমি রাজস্থানের দ্বিতীয় প্রাচীন এই শক্তিশালী কেল্লাটির প্রতিরক্ষাব্যবস্থা অতুলনীয় ছিল। বেলেপাথরের তৈরি সুদৃঢ় প্রাচীর ঘেরা এই দুর্গের উচ্চতা প্রায় ২৫০ ফুট্। প্রাচীরের বহির্ভাগের ৯৯টি বুরুজ দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যাবস্থাকে শক্তিশালী করেছে। ত্রিস্তরে বিভক্ত প্রাচীরটির প্রথম স্তরটি মজবুত পাথরের তৈরি, দ্বিতীয়টি দুর্গটিকে সাপের মতো পরিবেষ্টিত করেছে। তৃতীয় স্তরটি শত্রুসৈন্যর ওপর পাথর এবং ফুটন্ত জল ক্ষেপণ ও তাদের গতিরোধ করার জন্য ব্যবহৃত হোত। দুর্গে প্রবেশের চারটি সিংহদ্বার— সূরযপোল, গণেশপোল, অক্ষয়পোল এবং হাওয়াপোল।

উত্তর ভারতে অত্যাচারী সুলতানী শাসনের ফলে জয়সলমীর হিন্দু ও জৈন ব্যবসায়ী, মহাজন ও শিল্পীদের একটি সুরক্ষিত আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল। তাদের তৈরি 'হাভেলী'গুলো এক অভুতপূর্ব শিল্পকার্যের নিদর্শন রূপে আজও শহরে শোভা পাচ্ছে। উল্লেখযোগ্য 'পাটওয়ান কী হাভেলী', 'নাথমলজী কী হাভেলী', 'সেলিম সিংজী কী হাভেলী' এবং 'রাজা কী মহল' এর শিল্পের নিদর্শন তৎকালীন ভাটী রাজপুতদের শিল্পনৈপুণ্য ও রুচিবোধের পরিচয় দেয়। এছাড়া মহাবীর, পরেশনাথ, শান্তিনাথ প্রমুখ জৈন তীর্থঙ্করদের উৎসর্গীকৃত আটটি জৈন মন্দির এবং গণেশপোলে গণেশজী ও সুরযপোল সূর্যদেবের মূর্তিগুলো যেন পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে আরও ভাবগম্ভীর করে দেয়। দুর্গের অন্যতম দর্শনীয় স্থানগুলি হলো 'মেঘ দরবার' এবং তিন সহস্রাধিক প্রাচীন অমূল্য পুঁথির সংগ্রহশালা এক 'জ্ঞানভাণ্ডার'। শহরের অদূরে অবস্থিত তৎকালীন বাণিজ্য সড়কগুলির ওপর ধার্য কর ছিল জয়সলমীরের অর্থনৈতিক উন্নতির অন্যতম কারণ। এই সড়কগুলির মাধ্যমেই মধ্য-এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজ্যগুলোর মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বাণিজ্য পরিচালিত হোত।

মধ্যযুগে মুসলমান আক্রমণের প্লাবনে জয়সলমীর মূলত তার ভৌগোলিক অবস্থানের দরুন অধিকাংশ সময়েই অজেয় ও সুরক্ষিত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী বিপুল সৈন্যসম্ভারে জয়সলমীর আক্রমণ করে। বীরত্বের সঙ্গে ভাটী রাজপুতগণ দীর্ঘদিন শত্রুসৈন্যের প্রবল আক্রমণ পর্যদুস্ত করতে থাকেন। সহসা মহারাওল জেৎ সিংহ রণে বীরগতি প্রাপ্ত হলে তাঁর পুত্র মূলরাজের নেতৃত্বে রাজপুত সেনা গৈরিক বস্ত্রখণ্ড মস্তকে ধারণ করে অন্তিম সংঘাতের জন্য প্রস্তুত হন। জয়সলমীরের বীর রাজ-রমণীগণ জহরব্রতের আয়োজন করেন ও ২৪,০০০ রাজপুতনন্দিনী অনলে নিজ প্রাণ অর্পণ করেন। অবশিষ্ট ৩৮০০ রাজপুতবীর দুর্গের কপাট খুলে ঝাঁপিয়ে পড়েন শত্রুসমুদ্রের বুকে, প্রবল সংগ্রামের পরে তারা বীরগতি লাভ করেন। দুর্গ লুঠ করে সুলতানী ফৌজ দিল্লী প্রত্যাবর্তন করে। কিছু সময় পর জয়সলমীর পুনরায় ভাটী রাজপুতদের অধিকৃত হয়।

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে সুলতান ফিরোজশাহ জয়সলমীর অবরোধ করেন। রাজপুতগণ বেশ কিছুদিন দুর্গ থেকে অসীম বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ জারী রাখেন। সংগ্রামের শেষ পর্যায় ১৬,০০০ রাজপুত ললনা আগুনে প্রাণ বিসর্জন দেন। বীর রাওল দুদা ও তার পুত্র রাজকুমার তিলক সিংহের নেতৃত্বে অবশিষ্ট ১৭০০ যোদ্ধা লক্ষাধিক শত্রুসৈন্যের সঙ্গে প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করতে করতে বীরগতি প্রাপ্ত হন। খুব শীঘ্রই বীর ভাটীগণ দুর্গটি দখল করেন এবং পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে রাজ্যশাসন করতে থাকেন।

ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে আফগান সর্দার আমীর আলী শঠতার আশ্রয় নিয়ে সশস্ত্র পাঠানবাহিনী সমেত অতর্কিতে দুর্গে প্রবেশ করে দুর্গবাসীদের ওপর আক্রমণ চালায়। ভাটী বীরগণ মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত হন। দুর্গ যবনদের অধিকারে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী, রাজপত রমণীগণের পবিত্র জৌহরব্রত পালনের সময় বা পরিস্থিতি নেই, এ হেন পরিস্থিতিতে রাজমহিষীগণ আপন আত্মসম্ভ্রম রক্ষার্থে রাওল লুনাকর্ণের তরবারীতে প্রাণদান করতে থাকেন। অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত সাহায্য এলে যুদ্ধের স্রোত বিপরীত দিকে ঘুরে যায়। আমীর আলী পরাজিত হয় এবং তাকে হত্যা করা হয়। এই অভুতপূর্ব জহরব্রত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় 'অর্ধ-জৌহর' বা 'সাকো' নামে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। যদিও রাওল লুনাকর্ণ মুখল বাদশা হুমায়ুনের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন, কিন্তু বাদশা আকবরের শাসনকালে জয়সলমীর মুঘলদের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হয়। সাহাল সিংহের শাসনকালে (১৬৫১—১৬৬১) দুর্গটির পুনর্নির্মাণ করা হয়। মহারাওল মূলরাজের (১৭৬২---১৮১৯) শাসনকালে শহরের ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবল উন্নতি হয় এবং নগরী ধন-সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ হয়। ১৮১৮ সালে তিনি বৃটিশদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করেন। ১৯৪৭ অবধি জয়সলমীর ভারতীয় রাজা শাসিত বৃটিশ মিত্রসূত্রে আবদ্ধ স্বাধীন রাজ্যসমূহের অন্যতম ছিল। জয়সলমীর রণকৌশলের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। আজ ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে এই মরুশহরটি প্রসিদ্ধ। 'সোনার কেল্লা' নামে খ্যাত এই মরুশহরের সোনালি আভা যেন অতীতের স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়েরই প্রতীকরূপে বিদ্যমান।

জীবনে বিজ্ঞান

।। নির্মল কর।।

অনিদ্রাও ভাল

মেদ কমছে না কিছুতেই, চিন্তায় ঘুম ছুটেছে রাতের? কলোরাডোর 'স্লিপ অ্যান্ড ক্রোনোবায়োলজি ল্যাবরেটরি'র গবেষকেরা বলেছেন, এটা মন্দের ভাল। কারণ, নিদ্রাহীন রাত অনেক বেশি ক্যালরি পোড়ায়। জেগে এক রাত কাটালে বাড়তি প্রায় ১৩৫ ক্যালরি শক্তি খরচ হয়, যা দু'মাইল হাঁটার সমান। দেখা গিয়েছে, টানা ৪০ ঘন্টা জেগে রয়েছেন এমন যুবক-যুবতীদের বাড়তি ৭ শতাংশ শক্তি খরচ হয়েছে। তা বলে রাত জেগে রোগা হওয়ার চেষ্টা কিন্তু বিপজ্জনক।

ভয় নেই বেড়ালে

সাধের পোষা বেড়ালকে অনেকে আদর করতে ভয় পান। কারণ, এদের লালার সঙ্গে একরকম প্রোটিন নিঃসৃত হয়, যা কিছু কিছু মানুষের শরীরে অ্যালার্জির সৃষ্টি করে। ফলে আক্রান্তদের কাশি, শ্বাসকষ্ট, চোখ দিয়ে জল পড়ার মতো উপসর্গ দেখা দেয়। সম্প্রতি কানাডার অন্টারিও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা দাবি করেছেন, ওই প্রোটিনটির যে-অংশ অ্যালার্জি সৃষ্টি করে সেটি চিহ্নিত করে তাঁরা তার একটি প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছেন, যা অ্যালার্জি নষ্ট করে দেবে।

কৃত্রিম হৃদয়

বৃটেনের মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী মৃত ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড থেকে বিশেষ পদ্ধতিতে পেশিকোষ বের করে নিয়ে গবেষণাগারে অন্য ব্যক্তির দেহ থেকে স্টেম সেল নিয়ে ওই হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করিয়ে দেখলেন, এই স্টেম সেল মৃত হৃৎপিণ্ডের কাঠামোকে ঘিরে বৃদ্ধি পেয়ে একটি সুস্থ ও জীবিত হৃৎপিণ্ড তৈরি করেছে। গবেষকদের অন্যতম টেলর জানান, এই পদ্ধতি কার্যকর হলে রোগীর বিকল্প অঙ্গ সারানো অনেক সহজ হয়ে যাবে।

শ্যাওলায় সমাধান

জাপানের তেজস্ক্রিয় বিপর্যয়ে ক্ষতিকর তেজস্ক্রিয় মৌল স্ট্রনসিয়াম-৯০ বাতাসে মিশে মানবদেহে নানা রোগাক্রান্ত হচ্ছে। আমেরিকার নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে গবেষণা করে সম্প্রতি এর প্রতিষেধক হিসেবে একটি শ্যাওলার সন্ধান দিয়েছেন। তাঁদের দাবি, ক্লসটেরিয়াম মোনিলিফেরাম নামে ওই শ্যাওলা স্ট্রনেসিয়াম-৯০ কে বদলে দেয় কেলাসে। ফলে বাতাসে মিশে থাকা স্ট্রনসিয়াম-৯০ আর তেজস্ক্রিয় বিকিরণ করতে পারে না।

রঙ্গকৌতুক

সাম্প্রতিক নির্বাচনের আগে নিজের কেন্দ্রে প্রচারে গিয়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রী বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কবলে পড়ে যান, কেন বল্‌তো? মুখ্যমন্ত্রী বলে কথা!

—কেন আবার, ৩৪ বছরেও বিদ্যুতের তার না পাল্টাবার ফল।

***

মিতা : স্মার্টফোন ব্যবহার করা খুব রিস্ক, জানিস তো!

রীতা : ওই জন্যেই তো আমি ক্যাব্‌লা ফোন ব্যবহার করি।

***

বাবা : দেখি তোর মার্কশিট। একি, বাংলায় ১০, ইংরেজিতে ৯, অঙ্কে ৫! আমি তো বরাবর ৮০/৯০-এর উপরে নম্বর পেয়েছি। ছিঃ, তোকে আমার ছেলে বলে পরিচয় দিতে লজ্জা হয়।

ছেলে : বাবা, এটা তো তোমারই মার্কশিট—তোমার পুরনো আলমারিতে পেয়েছি।

***

—বাঙালির রোল মডেল কী?

—পেতি নেতা, প্রমোটার, অটোওয়ালা আর চিকেনরোলওয়ালা।

***

কর্তা : সুগারটা একটু বেড়েছে, বুঝলে।

গিন্নি : একটু মিষ্টি কথা খরচ কর, কমবে।

—নীলাদ্রি

মগজচর্চা

১। টেস্ট না-খেলা সে কোন্ দেশ ১৯৮৩ সালে বিশ্বকাপ খেলতে আসে?

২। 'বাফটা' (BAFTA) পুরস্কার কোন্ ক্ষেত্রে দেওয়া হয়— (ক) চলচ্চিত্র (খ) ব্যাঙ্কিং (গ) পর্যটন?

৩। রক্ত ও লৌহমানব বলা হোত কাকে?

৪। ঋক্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের সূক্ত সংখ্যা কটি?

৫। 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান'—গানটির রচয়িতা কে?

—নীলাদ্রি

উত্তর : ১। জিম্বাবোয়ে ২। (ক) চলচ্চিত্রে ৩। বিসমার্ককে ৪।
৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেহালার গণতন্ত্র রক্ষা দিবস

সংবাদদাতা।। হঠাৎ যেন মনে হলো টাইম মেশিনে চড়ে ফিরে এল ১৯৭৫ সালের ২৬ জুন! চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছি সারা দেশে আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা জারি হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী তখন প্রধানমন্ত্রী। একটা থমথমে ভাব। রাজনৈতিক নেতারা সব জেলে। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। সংবাদপত্রের মুখে কুলুপ! এইসবের মধ্যেই যেন ভেসে এল স্লোগান— ''গণতন্ত্র ফিরিয়ে দাও, প্রেসের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দাও, জরুরী অবস্থার অবসান চাই, আর এস এস-এর উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করো ইত্যাদি।'' দেখা গেল ৯ জন তরুণ ও কিশোরকে পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। দেশব্যাপী সত্যাগ্রহ শুরু হলো। গত ২৬ জুন, ২০১১, সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায়, বেহালার জনকল্যাণ বিদ্যাপীঠে আয়োজিত এক অনন্য অনুষ্ঠানের এই হলো ছবি। বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে আয়োজিত গণতন্ত্র রক্ষা দিবসের আলোচনা সভায় বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে পূর্বে উল্লিখিত টুকরো টুকরো ছবিগুলি ভেসে উঠছিল। বন্দেমাতরম্ গান ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সভার শুভ সূচনা ঘটে। পাঠচক্রের সভাপতি অলোকবরণ চ্যাটার্জীর বর্ণনায় উঠে এল ৩৬ বছর আগের জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষের সাথে বেহালায় সংগ্রামের প্রস্তুতির কথা। বেহালা থেকে যে ২০ জন সত্যাগ্রহী এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরা সবাই ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের স্বয়ংসেবক। এই অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা বিশিষ্ট সাংবাদিক অসীম কুমার মিত্র ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন মধ্যরাত্রে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক জরুরী অবস্থা জারির বিস্তৃত প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করেন এবং লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে সারা ভারতব্যাপী এক দুর্নীতি-বিরোধী আন্দোলনের কাহিনী তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন যে, জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও আর এস এস-এর কার্যকর্তাদের উদ্যোগে জনসংঘর্ষ সমিতির নামে সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী ১ লাখ লোকের বিশাল অভিনব সত্যাগ্রহ আন্দোলন হয়েছিল। তাতে ৮০ হাজার ব্যক্তি আর এস এস-এর সদস্য ছিলেন। বর্তমানে আন্না হাজারে ও রামদেবের দুর্নীতি-বিরোধী সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে জরুরী অবস্থার সময়ের আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করে অসীমবাবু দেখান যে, ১৯৭৫ সালের মতোই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে ও সেই মতোই বর্তমান দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করলে তবেই প্রকৃত গণতন্ত্র রক্ষা পাবে। এরপরে এল ৩৬ বছর আগের সেই তরুণ-কিশোর সত্যাগ্রহী যারা আজ কেউ প্রৌঢ়, কেউ বা প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে গেছে, তাদেরকে সংবর্ধনা দেওয়ার পালা। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের বরিষ্ঠ কার্যকর্তা কেশব দীক্ষিত মহাশয় স্মারকপত্র, পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয়ের মাধ্যমে তাদেরকে সংবর্ধিত করলেন। এই উপলক্ষে একটি তথ্যনির্ভর আকর্ষণীয় ও সংরক্ষণযোগ্য স্মরণিকা 'মাভৈঃ'-এর উন্মোচন করা হয়। সঙ্গীত অ্যাকাডেমির সদস্যদের সম্মিলিত কণ্ঠের দেশাত্মবোধক গান অনুষ্ঠানটিকে একটি অন্য মাত্রা এনে দেয়। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক ছিলেন জয়দেব মণ্ডল। এখানে উল্লেখ্য যে, এই অনুষ্ঠানে যাদের সংবর্ধিত করা হয় তাঁরা হলেন— (১) অসীম মিত্র, (২) বাদল ভট্টাচার্য, (৩) অসিতবরণ চ্যাটার্জী, (৪) অধীর কুমার মুখার্জী, (৫) বিকাশ প্রধান, (৬) হারু নস্কর, (৭) কানাই অধিকারী, (৮) সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, (৯) দিলীপ মুখার্জী, (১০) আনন্দময় সেন (৯) অজয় ভদ্র। এই অনুষ্ঠানে বেহালার স্বয়ংসেবক বরিষ্ঠ প্রচারক অমর কৃষ্ণ ভদ্রকে স্মারক এবং শাল দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

শিবিরে প্রণব নন্দ ও তন্ময় ভট্টাচার্য (বাঁ দিক থেকে)

কলকাতা বিড়লা মন্দিরে সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির

বিড়লা মন্দির সভাগারে দশদিন ব্যাপী সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির অনুষ্ঠিত হলো। গত ১৬ জুন থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় দু' ঘণ্টা ধরে সংস্কৃত শিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন বাইশ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁরা অধিকাংশই ছিলেন ইংরেজীভাষী। সংস্কৃত ভারতীর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকর্তা কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল শিক্ষক হিসাবে পাঠদান করেন। ২৫ জুন সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সকল শিক্ষার্থী সংস্কৃত ভাষায় গান, নাটক, অনুভব কথা প্রদর্শন করেন। কেবলমাত্র দশদিনেই সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে পেরে সকলেই গর্ব অনুভব করেন। কার্যক্রমে মুখ্য অতিথি ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ড. তন্ময় ভট্টাচার্য ও প্রধান অতিথি সংস্কৃত ভারতীর প্রান্ত সংগঠক প্রণব নন্দ।

রাজনীতিতে বংশ পরম্পরা কি অবসানের পথে ?

এম শঙ্কর

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহের প্রতিবেদনগুলি নিবিষ্টমনে পাঠ এবং প্রণিধানযোগ্য। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে তিনি আই আই টি মাদ্রাজে ভারতীয় গণতন্ত্রের অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রাজনীতির ক্ষেত্রে বংশপরম্পরার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর পরের বক্তা ছিলেন তামিলনাড়ুর ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধি-কন্যা কানিমোজি। তিনি তাঁর বক্তব্যের প্রথমেই রামচন্দ্র গুহের বক্তৃতার কিছু অংশের খণ্ডন করতে চাইলেন। কানিমোজি বললেন— তরুণ ভারতীয়েরা যারা তাদের পছন্দমতো ক্যারিয়ার গঠন করতে চায় রামচন্দ্র গুহ তাতে বাধা দিতে চাইছেন। তার বক্তব্য যদি কোনও ক্রিকেটারের পুত্র ক্রিকেট খেলায় যেতে চায় অথবা কোনও সঙ্গীতজ্ঞার কন্যা সঙ্গীতশিল্পী হতে পারে, তা হলে কোনও রাজনীতিকের পুত্র বা কন্যাকে রাজনীতিতে যোগদান করতে বাধা দেওয়া অবশ্যই অগণতান্ত্রিক।

কিন্তু রামচন্দ্র গুহ ওই যুক্তি মেনে নেননি। তাঁর বক্তব্য— রাজনৈতিক নেতাদের পুত্রকন্যা বা স্বজনেরা রাজনীতির উঁচুপদে অধিষ্ঠিত হয়। যেমন কানিমোজিকে পিতা করুণানিধি রাজ্যসভার এম পি নির্বাচিত করেছেন, সোনিয়া গান্ধীর পুত্র রাহুল গান্ধী হয়েছে কংগ্রেস পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি, এমনকী লালু যাদবের সহায়তায় পত্নী রাবরি দেবী মুখ্যমন্ত্রী। রাজনীতির সঙ্গে সংস্রবহীন ব্যক্তিকে শুরু করতে হবে একজন সাধারণ পার্টিকর্মী রূপে। রাজনৈতিক নেতার আত্মীয়েরা অন্যায় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। যুবরাজ সিং বা এম এস ধোনি কমার্সিয়ালের বিজ্ঞাপন থেকে যে অর্থ উপার্জন করেন তা ক্রিকেটের ক্ষেত্রে তাঁদের কৃতিত্বের জন্যে। অন্যদিকে আলাগিরি বা দয়ানিধি মারানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ক্যাবিনেট মিনিস্টার হওয়া অত্যন্ত রাজনৈতিক শক্তিশালী পিতাদের পুত্র হবার সুবাদে।

শক্তিমান রাজনৈতিক নেতাদের সন্তান হবার জন্যে রাজনীতিতে যোগ দিলে সংশ্লিষ্ট দলেরই অবনয়ন ঘটে। সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়েই, ঐতিহাসিক গুহ বলেন, ডি এম কে এবং আকালি দলের সূচনা। জাতি-সমতা ছিল প্রথম দলটির উদ্দেশ্য, দ্বিতীয় দলটির উদ্দেশ্য ধর্মগুরুদের মুক্ত করা ভ্রষ্ট-প্রিষ্টদের নিয়ন্ত্রণ থেকে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আঞ্চলিক সুখ সুবিধার দাবিতে এই দলগুলি সোচ্চার হয়েছে। পশ্চাদবর্গের মানুষদের দাবি নিয়ে আন্দোলন করেছে সমাজবাদী পার্টি ও রাষ্ট্রীয় জনতা দল। প্রথম দিকে দলের আদর্শ নিয়ে তারা উচ্চকণ্ঠ হয়েছে। কিন্তু দলের নেতাদের সন্তানদের মঞ্চে আগমনের পরে নেতারা নেতৃত্ব এবং এতদিনের রাজনৈতিক সুফল তাদের হাতে সমর্পণেই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

এ বিষয়ে পাঁচ বা দশ বছর আগে অধিকাংশ মধ্যবিত্তের মনোভাব ছিল, রামচন্দ্র গুহের মতে, অদৃষ্ট বা ভাগ্যবাদী (‘ফেটালিস্টিক’)। তাঁরা বলতেন এটা রয়েছে আমাদের, ‘ডি এন এ’-এর (রক্তের) মধ্যেই। রাজনীতিতে বংশপরম্পরা তো প্রবাহিত হবেই।

উদাহরণ দিয়ে শ্রীগুহ প্রমাণ করেছেন— অবস্থার এখন পরিবর্তন হচ্ছে। ২০১০ সালে রাজ্যে নির্বাচনের আগে বিহারে লালু প্রসাদ তাঁর যুবক পুত্রকে নির্বাচক মণ্ডলীর সামনে উপস্থিত করেছিলেন। কিন্তু দু’জন নেতা— নীতিশকুমার ও সুশীলকুমার মোদির সমবেত চেষ্টায় নেতা লালু যাদবের আর জে ডি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। উল্লেখ্য, নীতিশ কুমার এবং সুশীল কুমার মোদি, দুই নেতাই তাঁদের রাজনীতি থেকে নিজেদের পরিবারকে সম্পূর্ণ দূরে রেখেছেন। তামিলনাড়ুর নির্বাচনের আগে করুণানিধি বারবার ভোটারদের মনে করিয়ে দিয়েছেন তামিল সম্প্রদায়ের জন্যে তাঁর বহু দশকের অবদান। তাঁর সে আবেদন ব্যর্থ। তামিল সাহিত্যে তাঁর অবদান তাঁরা মেনে নিয়েছেন, কিন্তু ডি-এম-কে দলকে ‘ফ্যামিলি ফার্মে’ ('family firm) পরিণত করাকে তাঁরা বরদাস্ত করেননি।

প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জির বিপুল জয় সম্পর্কে অনেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, কিন্তু তামিলনাড়ুতে জয়ললিতার সুবিপুল জয়লাভ সম্পর্কে কেউ বলেননি। এমন কী, বিহারের চেয়েও এই নির্বাচন 'dynastic politics'--- বংশাণুক্রমিক রাজনীতির প্রত্যাখ্যানের উজ্জ্বল উদাহরণ। উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টির অবনয়নের কারণ হিসেবে অনেক নির্দেশ করেছেন মুলায়ম সিং যাদব দ্বারা পুত্র অখিলেশ যাদবকে তার উত্তরাধিকার রূপে অভিক্ষেপন (প্রজেকশন)— মধ্যস্তরীয় নেতাদের উপেক্ষা করে তরুণ অখিলেশকে উন্নীত করায় তারা ক্ষুব্ধ। রাজনীতিতে বংশাণুক্রমিকতা হ্রাস পেতে শুরু করলেও তা এখনও ব্যাপক রূপে দেখা দেয়নি। আগামী বছর উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে নির্বাচন হবার পরে যাদব এবং বাদলদের ভাগ্য নির্ধারিত হবে, হয়তো গান্ধি-ধারারও। এই মুহূর্তে রাহুল গান্ধি উত্তরপ্রদেশে খুবই সক্রিয় এবং কংগ্রেসের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট। তা হলেও ঐতিহাসিক গুহ মনে করেন, আমজনতার প্রবণতা তাঁর মতকেই বেশি সমর্থন করার দিকে কানিমোজির চেয়ে।

আম জনতার প্রবণতা সেইসব রাজনৈতিক নেতাদের সমর্থন করার দিকে যাঁদের কোনও পরিপূর্ণ পারিবারিক জীবন অথবা পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই। নীতিশ কুমারের পরিবারের কে, কতোজন, কোথায় আছেন— কেউ জানে না, না তাঁর সন্তানদের কথা। আরও কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রী পারিবারিক জীবন থেকে দূরত্বে রয়েছেন। মায়াবতী, নরেন্দ্র মোদি, জয়ললিতা, নবীন পট্টনায়ক এবং মমতা ব্যানার্জি—সবাই অবিবাহিত। সন্তান-পরিবৃত না হওয়ায় তাঁদের পরিপূর্ণ মনোযোগ দেশের প্রতি।

মুখ্যমন্ত্রীরূপে মায়াবতী, মোদি এবং জয়ললিতা অথরিটেরিয়্যান-এর আচরণ করেছেন— মন্তব্য করেন রামচন্দ্র; তাদের স্টেট, তাদের পার্টির প্রতি তাদের আচরণ যেন এগুলি তাদেরই প্রসারণ (এক্সটেনশন)।

মমতা ব্যানার্জিকে সবাই ‘দিদি’ বলেই সম্বোধন করতেন, এখন দলের লোকেদের কাছে তিনি ‘লীডার’— নেত্রী। নেতৃত্বের পদক্ষেপে রাজ্যকে তিনি কোন পথে পরিচালিত করছেন, শুধু পশ্চিমবঙ্গের মানুষই নয়, সমস্ত ভারতের জনতা সেই দিকে তাকিয়ে আছে।

রঙ্গম

ধারাবাহিকে স্বদেশপ্রেমের জোয়ার

ভালবাসাহীন সন্তানের কথা ভেবে ‘মা তোমার জন্য’

মিতদ্রু দত্ত

স্বদেশকে ভালবেসে আত্মত্যাগের কথা আজ শুধুই গল্প বা কাহিনী। আজকের তরুণ প্রজন্ম তাদের কথা শুনে হাসাহাসি করে। পাগল বলে। ২০০ বছরের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়েছিল। দেশের সার্বভৌমত্ব বিক্রি করতে চেয়েছিল। দেশপ্রেমিকরাই স্বাধীনতার যুদ্ধে নিজেদের বলিদান করে দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেন আমাদের। তাই ১৯৪৭ সালে আমরা স্বাধীনতা পেলাম আর তাঁদের ভুলেও গেলাম যাঁরা প্রাণ ত্যাগ করলেন দেশের সম্মান রক্ষার্থে। ‘মাতৃভূমিকে ভালবাসা যদি অপরাধ হয়, তাহলে আমরা অপরাধী’ বলেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। আর সেই কাহিনীই এবার ১০০ পর্বের মেগা ধারাবাহিক হয়ে আসতে চলেছে কলকাতা দূরদর্শনে। অভিনয়ে আছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া দেবী, গীতা দে, দীপঙ্কর দে, দোলন রায়, পার্থসারথি দেব, অনামিকা সাহা প্রমুখ। ধারাবাহিকটির প্রযোজনার দায়িত্বে আছে ঐকতান এন্টারটেনমেন্ট। পরিচালনা অনিরুদ্ধ দত্তর। সংগীতে আছেন কুমার শানু, এ আর রহমান, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি, ইন্দ্রাণী সেন, স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত, শান প্রমুখ। কাহিনী ও চিত্রনাট্য অনিরুদ্ধ দত্তর লেখা। আসলে ২০১১ সালেও আমরা কতটা স্বাধীনতা লাভ করেছি সেই প্রশ্নই করা হয়েছে ধারাবাহিকের মাধ্যমে। দেশের যুবসম্প্রদায় আজ নেশাগ্রস্ত। পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতি আজ আমাদের গ্রাস করছে। জাতীয়তাবাদও আজ সহজলভ্য পণ্য হচ্ছে। নারী ধর্ষণ চলছে। নারী পাচার ও অনুপ্রবেশ চলছে দেদার। কেউ কথা রাখেনি। না সরকার, না পুলিশ, না প্রশাসন। বাংলা শেষ হয়ে যাচ্ছে। সব দিক থেকে। ভাল রাজনীতিবিদেরও দেখা নেই এই সময়ে, যে প্রকৃত দেশপ্রেমিক। অথচ আমরা প্রত্যেকেই আমাদের মা-কে ভালবাসি। দেশমাতৃকার চরণবন্দনা করি। বন্দেমাতরম্ উচ্চারণ করি। পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষিতও হই। কিন্তু অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে ভয় পাই। দেশের জন্য কিছু করতে চাইলেও পারি না। কেন পারি না? তাই নিয়েই কাহিনী। তাই নিয়েই এ ধারাবাহিক। দেশ মায়ের জন্য এ ধারাবাহিক তুলে ধরেছেন পরিচালক। নতুন প্রজন্মকে দেশব্রতী করে তুলতে এ ধারাবাহিকটি একটি মাধ্যম হতেই পারে।

বৃটিশ অত্যাচার ও বঞ্চনার ইতিহাসে সমৃদ্ধ ‘স্বাধীনতা’

মিতদ্রু দত্ত

কলকাতা দূরদর্শনে আসতে চলেছে ভিন্ন স্বাদের বাংলা মেগা ধারাবাহিক ‘স্বাধীনতা’ ‘অনেক মশলা’ ধারাবাহিকের ভিড়ে ইটিভির সাধক বামাক্ষ্যাপা যেমন দর্শক হৃদয়ে অন্য একটি উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত তেমনই ‘স্বাধীনতা’র পরিচালক রাজীব চন্দ্র মনে করছেন অন্যরকম এক ঢেউ তুলবে এই মেগা। মেগাধারাবাহিকের পটভূমি ১৯৩০ সালের পশ্চিমবঙ্গ। ইংরেজ শাসনে আজকের বাংলার কথা। মোট ১০০টি পর্বে ভাগ করা রয়েছে ধারাবাহিকটি। ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন, গান্ধীজি, নেতাজী, স্বামীজী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলামের মতো অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বদের জীবনী, বাণী ও আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে কাহিনীটিতে। অভিনয়ে আছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণী মণ্ডল, বোধিসত্ত্ব মজুমদার, অনামিকা সাহা, জর্জ বেকার, রমাপ্রসাদ বণিক (অধুনা পরলোকগত), সৌমিত্র বসু, জয়জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়, মৈত্রেয়ী, কাঞ্চনা মৈত্র, মল্লিকা মজুমদার প্রমুখ। ছোট পর্দার জনপ্রিয় সব নামেদের দেখা যাবে অন্যবেশে। ইংরেজ শাসনের পটভূমিতে তখনকার দেশপ্রেম, তখনকার আবেগ, ব্যক্তিপ্রেম ও সমাজ জীবনের নানা টুকরো ছবি তুলে ধরা হয়েছে এখানে। সংগীতে আছেন হৈমন্তী শুক্লা, ইন্দ্রাণী সেন, ইন্দ্রনীল সেন, নচিকেতা, কবীর সুমন, শিলাজিৎ, বাংলা ব্যান্ড ক্যাকটাস। সেই সময়ের ইতিহাস বইয়ের পাতা থেকে বড় পর্দায় তুলে ধরার কারণ একটাই। নতুন প্রজন্মের মধ্যে দেশেপ্রেমকে জাগ্রত করা। এমনটাই দাবি পরিচালক রাজীব চন্দ্রের। তিনি বলেন, বহু গবেষণার মধ্য দিয়েই তৈরি করা হয়েছে এই মেগা ধারাবাহিকটি। রয়েছে হোসেনুর রহমান, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অন্নদাশংকর রায়, রতন খাসনবীশ-দের মতো ব্যক্তিত্বদের স্বাধীনতা সম্পর্কে মতামত। ইংরেজের অত্যাচার, দেশবাসীর চরম দুর্ভোগ ও দুর্দশার ইতিহাস। বঞ্চনা সন্ত্রাস ও শোষণের রক্তাক্ত ইতিহাস। দেশপ্রেম তখন ঠিক কী রকম ছিল তাও ধারাবাহিকের প্রতিটি পর্বে দেখানো হবে। থাকছে স্বাধীনতা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে কুইজও। থাকছে আকর্ষণীয় পুরস্কার। বাংলা সিরিয়ালের জগতে জাতীয়তাবাদী ধারাবাহিক বড় একটা নির্মিত হয় না। এবার এই ভিন্ন স্বাদের ধারবাহিক জনপ্রিয় হবে বলেই মনে হয়।

শব্দরূপ-৫৮৯ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

১	■	২		৩	■	৪	■
	■		■	৫			■
৬			■		■		■
	■	■	■	■	৭		৮
৯	১০		■	■	■	■	
■		■	১১	■	১২		
■	১৩			■		■	
■		■	১৪			■	

<u>সূত্র</u> :

পাশাপাশি : ২. বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার, **৫.** চণ্ডিকা, অগ্নির সপ্তজিহ্বার এক, **৬.** বাসুকির ভ্রাতা (পরীক্ষিৎকে দংশন করিয়াছিল), **৭.** চাপরাস, মেডেল, **৯.** সুবল রাজপুত্র (দুর্যোধনের মাতুল), **১২.** উত্তম হস্তী, ঐরাবত, **১৩.** কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে উক্ত ধনপতি সওদাগরের প্রথমা পত্নী, **১৪.** দশমহাবিদ্যার এক, রাজরাজেশ্বরী, মিষ্টি লেবু বিশেষ।

উপর-নীচ : ১. যাহার চুল পাকা, **২.** সুগন্ধকারক ছোটগাছ বিশেষ (ঔষধ), **৩.** পণ্যদ্রব্যের লেবেলে অনেক সময় লেখা থাকে, ''—হইতে সাবধান'' **৪.** কাঁকড়া, **৮.** জ্যোতিষে শুভযোগ বিশেষ, দুর্লভ সুযোগ, **১০.** যে অপরের লেখা হইতে চুরি করে **১১.** শিবধনু, **১২.** আফ্রিকার বৃহদাকার বানর বিশেষ।

সমাধান
শব্দরূপ-৫৮৭
<u>সঠিক উত্তরদাতা</u>
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
অশোক বেরা
খড়্গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

■	■	কু	শ	ধ্ব	জ	■	জ
অ	ব	ন্তী	■	■	বা	■	য়
■	ং	■	■	■	ব	স	ন্ত
কু	শ	ণ্ডি	কা	■	■	ং	■
■	বী	■	■	দু	ঃ	শ	লা
অ	ট	বি	■	■	■	প্ত	■
ক্রূ	■	দু	■	■	ম	ক	র
র	■	র	ত্না	ক	র	■	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৮৯ সংখ্যার সমাধান আগামী ১ আগস্ট, ২০১১ সংখ্যায়

।। চিত্রকথা ।। সর্প যজ্ঞ ।। ১২

গঙ্গাকে দূষণ মুক্ত করতে আন্দোলন চলবে : উমা ভারতী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ভারতীয় জনতা পার্টির সুপরিচিত নেত্রী সন্ন্যাসিনী উমা ভারতী এবার দলকে নিয়ে গঙ্গা নদীকে দূষণমুক্ত করার জন্য আন্দোলনে নামছেন। এজন্য গত ১১ জুলাই সকালে উত্তর কলকাতার ঘাটে মা গঙ্গার আরতি ও বিধিমতো পূজার্চনা করেন। পরে মহাজাতি সদনে (এ্যানেক্স) সভাগারে ভাষণ দেন ও সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। গঙ্গার কূলকে কেন্দ্র করেই সত্য যুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত মিলন মেলা বসেছে। গঙ্গার জল শুধু পানীয় জল বা পবিত্রতার জন্যই নয়, সেচের ফলে হিন্দু-মুসলমান সবাইকার অন্নও যোগান দেয়। গঙ্গা শুধু ভারতের নয় বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নদী বলে সুশ্রী উমা ভারতী

গঙ্গায় দুগ্ধাভিষেক করছেন উমা ভারতী : ছবি- শুভঙ্কর মুখার্জী

দাবী করেন। গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত এর বারিধারাকে অবিরল প্রবাহিত হতে দিতে হবে। খনন মাফিয়া এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের হাত থেকে (পাওয়ার বা বিদ্যুৎ মাফিয়া) গঙ্গাকে সবাই মিলে রক্ষা করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত না কেন্দ্র সরকার পবিত্র গঙ্গানদীকে জাতীয় নদী এবং জাতীয় ঐতিহ্য বলে ঘোষণা করে বোর্ড গঠন না করছে, ততদিন তাঁর আন্দোলন চলবে। যদি সরকার তা না করে, তাহলে আগামী অক্টোবরেই দিল্লীতে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। গঠিত হবে এক সমিতি। সেখানে দেশ-বিদেশের পরিবেশবিদদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। গঙ্গার জল বিশুদ্ধ থাকার কারণ জলের এক বিশেষ কেমিক্যাল (ব্রহ্মদ্রব)।

পরের ধাপে আন্দোলন আগামী নভেম্বর মাসে গঙ্গার উপকূল বরাবর 'মানবশৃঙ্খল' হবে। শ্রীমতী উমা ভারতী বলেন, বিগত ৫০ বছরে গঙ্গাকে দূষিত করা হয়েছে স্বাধীন ভারতে। ইংরেজরাও জাহাজে যাতায়াতের পথে গঙ্গার জলই নিয়ে যেত। টেহরি এবং কয়েকটি জায়গায় তো গঙ্গাকে সরু নালায় পরিণত করা হয়েছে। কানপুরে গঙ্গার জল তো ব্যবহারের অযোগ্য। তিনি আরও বলেন, যেদিন কানপুরের গঙ্গার জল পানের যোগ্য হবে সেদিনই তিনি অন্নগ্রহণ করবেন। অন্যথায় ফলাহার করেই কাটাবেন। তাঁর প্রিয় মালপোয়াও সেদিনই খাবেন। একাজে সবাইকে সহযোগী হওয়ার আবেদন জানান তিনি। সোজা বক্তব্য, "হম উস দেশকে বাসী হ্যায়, জিস দেশ মেঁ গঙ্গা বহতী হ্যায়।" সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, আন্না হাজারে এবং রামদেবজী যা করছেন সেজন্য তাঁর সম্পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। তাঁর মতে 'প্রধানমন্ত্রী'কেও লোকপাল-এর আওতায় আনা দরকার। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অন্ততঃপক্ষে একবছর নতুন সরকারকে কাজ করার সুযোগ দেওয়া দরকার। এই 'সমগ্র গঙ্গা' আন্দোলনে তিনি বিজেপি'র সাহায্য নেবেন মানবপ্রাচীর-এর জন্য। এই আন্দোলন সকলের এবং তাঁর অভিজ্ঞতা— দলমত নির্বিশেষে সকলেই সামিল হচ্ছেন।

মহাজাতি সদনের সভায় ভাষণ দেন বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী ও সিদ্ধার্থনাথ সিংহ। সভা পরিচালনা করেন, অসীম সরকার। বিজেপি'র রাজ্য সভাপতি রাহুল সিন্হা ও কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সিদ্ধার্থনাথ সিংহ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

কালো টাকা উদ্ধারে সুপ্রিম কোর্টের পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কালো টাকা উদ্ধার করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের গা-ছাড়া মনোভাবে ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্ট দুই অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে সামনে রেখে বিশেষ তদন্তকারী দল (স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টীম বা সীট) গঠন করেছে। সীটের চেয়ারম্যান হিসেবে থাকছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বি পি জীবন রেড্ডি এবং ভাইস চেয়ারম্যান হলেন অবসরপ্রাপ্ত অপর বিচারপতি এম বি শাহ। সুপ্রিম কোর্ট সূত্রে জানা গিয়েছে বিদেশে ভারতীয়দের সঞ্চিত বে-আইনী অর্থের ওপর তদন্ত ও নজরদারি করার জন্য সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সীটকে। এনিয়ে একনজরে দেখে নেওয়া যাক কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য :

- কালো টাকার অ্যাকাউন্টগুলো নিয়ে তদন্ত করতে ১৩ সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল বা সীট গঠন করা হলো।
- সীটের চেয়ারম্যান হিসেবে থাকছেন সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বি পি জীবন রেড্ডি এবং ভাইস- চেয়ারম্যান হিসেবে থাকছেন আরেক অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এম বি শাহ।
- সীটে থাকছেন আই বি (ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো), রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং (র), সেন্ট্রাল ব্যুরো অব্ ইনভেস্টিগেশন (সি বি আই), সেন্ট্রাল বোর্ড অব্ ডিরেক্ট ট্যাক্সেস (সিবিডিটি), নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো, রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স, ফাইনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট-এর প্রধানরা। এছাড়াও থাকছেন, রেভিনিউ সচিব, সিবিডিটি-র যুগ্ম-সচিব এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্নর।
- লিচটেনস্টেইন ব্যাঙ্কের সমস্ত অ্যাকাউন্ট হোল্ডার যাদের নিয়ে তদন্তের প্রক্রিয়া চলছে অথবা সম্পূর্ণ হয়েছে তাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য সরকারের কাছ থেকে চাওয়া হয়েছে।
- সরকারি তরফ থেকে যাদের বিরুদ্ধে তদন্তের কোনওরকম উদ্যোগ নেওয়া হয়নি সেইসব অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের ছাড় দেওয়া নিয়ে অসন্তুষ্ট আদালত।
- আদালত কেন্দ্রীয় সরকারকে শ্লথ তদন্ত, জাতীয় সুরক্ষার প্রেক্ষিতে তদন্তের ব্যর্থতা, হাসান আলিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে ব্যর্থ হওয়া প্রভৃতি ব্যাপারে সরকারকে দোষারোপ করেছে।
- হাসান আলি, কাশীনাথ তাপুরিয়া-র মতো অথবা যে কোনও ভারতীয় বা ভারতে বসবাসকারী আইনি সত্তার (লিগ্যাল এন্টিটি) কালো টাকার অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে তদন্ত করার পাশাপাশি তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী ও ক্রিমিনাল আইনী পদ্ধতি চালিয়ে শাস্তি ঘোষণাও করতে পারবে সীট।
- ভবিষ্যতে কালো টাকা চিহ্নিত করতে প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানগত কাঠামোর জন্য তুলনামূলক অ্যাকশান প্ল্যান তৈরি করছে সীট।
- তদন্তে সরকারের 'সিরিয়াসনেসের অভাব' তুলে ধরেছে 'রাষ্ট্রের নরম পন্থা'।

Swastika RNI No. 5257/57
18 July - 2011
Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O./SSRM-Kol. RMS/RNP-048/LPWP-028/2010-12

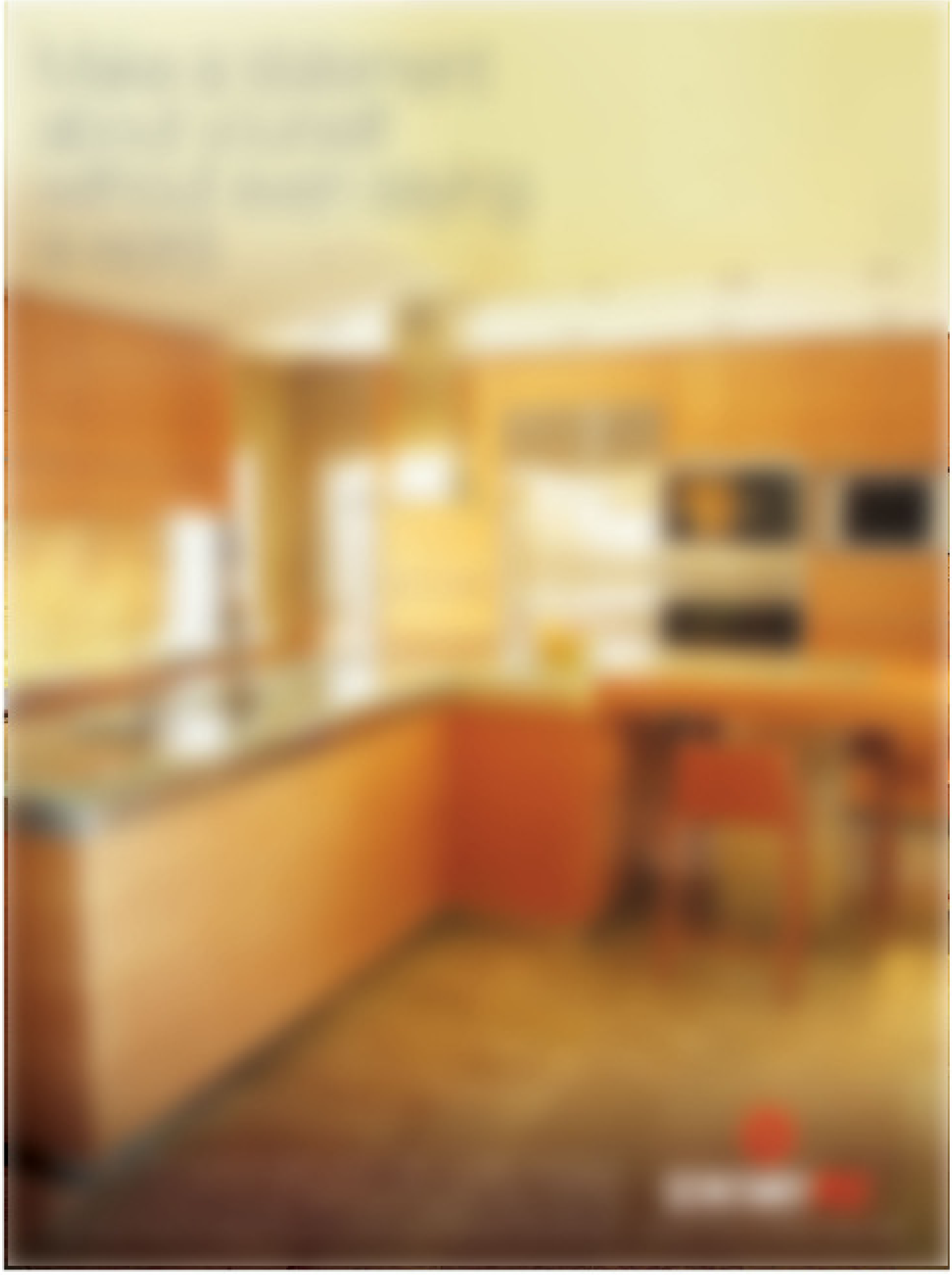

দাম : ৫.০০ টাকা